স্মৃতিভারে

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী
কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক-প্রধান,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক
ও মুরলীধর গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

ভূমিকা

॥ শ্রীঃ ॥

"স্মৃতিভারে" বইখানি একজন শিক্ষিত সংস্কার-পূত ব্যক্তির চিত্তে, এ যুগের কতকগুলি মহান্ ও বিরাট্, সরল ও ভাবশুদ্ধ এবং বিভূতিমান্ চরিত্রের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কি ভাবে দেখা দিয়াছে, তাহার একটি সুন্দর আলেখ্য। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, এবং সারা অবিভক্ত বাঙ্গালায় বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপনা করিয়া বিশেষ সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার মনটি কেবল নিছক পণ্ডিতের মন নহে, তাহার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি আছে, ভাবুকতা আছে, সৌন্দর্যবোধ আছে, শালীনতাজ্ঞান আছে, এবং সর্বোপরি শাশ্বত সত্তা বা সত্য সম্বন্ধে আগ্রহ বা আকূতি এবং অনুভূতি আছে। ইহার দ্বারাই তাঁহার দর্শন, সত্যদর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। শিশুকাল হইতে বার্ধক্যের প্রারম্ভ পর্যন্ত যে-সমস্ত লক্ষণীয় চরিত্রের মানুষের সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও অন্যত্র তাঁহার সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাহার দ্বারা তাঁহার চিত্ত যে ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, এবং যে সকল ছোট-ছোট কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তাঁহার চিত্তে আলোড়ন আনিয়াছিল, সেই সমস্তের স্মৃতিকে আধার করিয়া এই উপাদেয় বইখানি রচিত হইয়াছে। তিনি যাহা স্বয়ং দেখিয়াছেন, যাঁহাদের শুভ সংস্পর্শ তিনি পাইয়াছেন, অতি সুন্দর সাবলীল মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি তাঁহার তৎসম্পর্কিত ব্যক্তিগত আনন্দ ও মানসিক সংস্কৃতির স্পর্শ আমাদের মনের মধ্যেও আনিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার প্রাক্তন শিক্ষকদের কথা, তাঁহার "এলাহি ভরসা"র মত মর্মস্পর্শী প্রসঙ্গ, তাঁহার দেখা শ্রেষ্ঠ মনীষী ও জননেতাদের চরিত্রচিত্রণ, সকলকেই আনন্দ ও শিক্ষাদান করিবে, মনের প্রসার আনিয়া দিতে সহায়তা করিবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরিচিতি

প্রতি মানুষেরই জীবনের অভিজ্ঞতা অনন্যসাধারণ। এমন কি সাধারণ মানুষের স্মৃতিভাণ্ডারেও অনুসন্ধান করলে মনকে স্পর্শ করে এমন অভিজ্ঞতা খুঁজে পাওয়া যায়। যাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ব্যাপক তাঁর সম্পদ ত আরও বেশী হবেই।

অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের গ্রন্থখানি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাঁর জন্ম। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। স্বাধীনতার পূর্বযুগে তিনি অনেক শাসক ও অধ্যাপক ইংরেজের সংস্পর্শে এসেছেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকের স্নেহ আকর্ষণ করেছেন। এইভাবে জীবনের নানা অধ্যায়ে মনে রাখবার মত যে সব কাহিনী তাঁর স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল তাদের সংগ্রহ ক'রে শ্রেণীবিভাগ ক'রে সাজিয়ে তিনি এই পুস্তকে স্থাপন করেছেন। নির্বাচন এমন দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়েছে যে প্রতিটি কাহিনীই সুন্দর। তারা প্রমাণ করে যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের মনেই মহৎগুণ আশ্রয় নেয়। সুযোগ পেলেই সে গুণ আত্মপ্রকাশ করে, ছোট কি বড়, হিন্দু কি মুসলমান, কালো কি ধলো, তা নিয়ে বিচার করে না। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে জীবনস্মৃতি হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ

যারা আমাকে প্রীতি ও সহমর্মিতা দিয়ে গ্রহণ করেছিল, জিজ্ঞাসা ও শুশ্রূষা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল—ধনমানহীন শিক্ষককে সত্যকার 'দ্বিজত্ব দান করেছিল,—আমার সেই বিশালপ্রাণ সুবৃহৎ ছাত্রসমাজকে স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ মথিত স্মৃতিসাগরের উপকূল থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া ক'টি-মাত্র অবিদ্ধ অশোধিত রত্ন উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করলাম।

গ্রন্থকার

প্রস্তাবনা

স্মৃতিচারণের অধিকার অসাধারণের। আমাদের নয়। বর্তমান প্রয়াসের যৌক্তিকতা তবে কোথায়? কৈফিয়ৎ দিতে হয়। স্বাধীনতালাভ ও দেশ-বিভাগের পরে চট্টগ্রামের সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিমের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক এক শোকসভা আহূত হয় কোলকাতায়। সর্বজনবরেণ্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। সুহৃদ্বর কাজী আবদুল ওদুদ, ডাঃ বিনোদবিহারী দত্ত, স্বর্গত সজনীকান্ত দাশ-প্রমুখ সহৃদয়েরা উপস্থিত ছিলেন সে-সভায়। সেখানে কিছু বলবার জন্য আহূত হয়েছিলাম। 'এলাহি ভরসা'-শীর্ষক প্রসঙ্গটি সেই সভায় বিবৃত করি। সভা-অন্তে আচার্য চট্টোপাধ্যায় আমাকে অনুযোগ দিয়ে বলেন, এই-জাতীয় ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করিনি কেন। ঘটনাটির বিবৃতি নাকি তাঁকে সত্যই অভিভূত করেছিল। অবশ্য এই ঘটনাটি 'ঢাকা বোর্ড অব্ ইণ্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন'-এর অনুরোধে মৎ-সংকলিত 'অবদান' গ্রন্থে সংকলয়িতার রচনা হিসাবে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পূজ্যপাদ মনীষী আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের অবশ্য-পাল্য নির্দেশটি স্মরণে রেখেছিলাম। তাঁর সুভাষিত এই গ্রন্থের শিরোভাগে সন্নিবেশ করা হ'ল। 'রবীন্দ্র-ভারতী'র সুধী উপাচার্য শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই রচনার বহুলাংশ পাঠ করে প্রীতিভরে তাঁর অভিমত প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থের নাম-নির্দেশক প্রথম প্রসঙ্গ 'স্মৃতিভারে'র বিষয়বস্তু দেশবরেণ্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে তাঁর 'সবিতা'-পত্রিকার জন্যে লিখিত হয়েছিল। আমার প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক ডাঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে সেণ্ট্ জেভিয়র্স্ কলেজ-পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত স্মৃতিকথাটি লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কবি নজরুল ইসলাম-সংক্রান্ত ঘটনা দু'টি একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংকলিত স্মারক-গ্রন্থে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সংক্রান্ত রচনাটির বহুলাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। অপরাপর ঘটনাগুলি নানা প্রসঙ্গে নানা সভাসমিতিতে বিবৃত হয়েছে—যতদূর মনে পড়ে লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়নি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-সংসদের বৈঠকে দু'একটি প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছিল। গুরু-শিষ্য পর্যায়ের 'আমার বাংলাদেশের সন্তান' প্রসঙ্গটিতে একটি গুরুতর তথ্যগত ভ্রান্তি রয়েছে। আচার্য শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপকের

পদ অলঙ্কৃত করেন, ডাঃ তারাপুরওয়ালা তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থাকতেই, ডাঃ তারাপুরওয়ালার বিশ্ববিদ্যালয়-ত্যাগের পরে নয়। কালক্রম-সম্পর্কিত এই ভ্রমটির জন্য আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বহু শতাব্দীর পরাধীনতার শৃংখল উন্মোচন করে আমরা নতুন জীবন গড়বার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। দিকে দিকে আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আন্তর্জাতিকতা, শিল্পবাণিজ্য, বিজ্ঞানমুখিতা, কারিগরি বিদ্যা, নতুন সাহিত্য ও সঙ্গীত এবং নানা প্রসাধনকলার পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীন ভারতের অর্থ ও সামর্থ্য অকৃপণভাবে ব্যয়িত হচ্ছে। কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব সমস্ত প্রয়াস ও সমস্ত সাধনার সার্থকতাকে যেন প্রতিহত করে দিচ্ছে! অভাবটি কোথায়, ভাববার ভার দেশবাসীর উপর ছেড়ে দিলেই ভালো হয়।

মানুষের উপর মানুষকে নির্ভর করতে হবে একান্তভাবে। মানুষের চারিত্রিক নির্ভরযোগ্যতা যন্ত্র-সমারোহের উর্ধ্বে নয় কি? আমাদের এই বাংলার পাঁচশো বছর আগেকার একটি পুরোনো কথার উপর জোর দিতে ইচ্ছে হয়। "সবার উপরে মানুষ সত্য।" খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে একবার এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে আর একবার এই সত্যের যুগোচিত উপলব্ধি এদেশে নবজাগৃতি বহন করে এনেছিল।

দীর্ঘদিন মানুষ গড়বার কারখানায় মজুরি করেছি। স্বীকার করি, অকিঞ্চিৎকর-সাধনা সার্থক করে তুলতে পারি নি। জানি, মানুষ হয়ে মানুষ গড়তে হয়। কিন্তু একথাও সত্য, মানুষ দেখেছি, জীবনের নানা স্তরে। তাঁরা প্রখ্যাত অথবা অপ্রখ্যাত। ছাত্র-সমাজের মনুষ্যত্ব-জিজ্ঞাসায় এখনও আস্থা হারাই নি। তাই অন্ততঃ তাদের কাছে আংশিকভাবে তুলে ধরি মনুষ্যত্বের স্মৃতিভার-বাহীর বেদনা।

সূক্ষ্ম অনুভবকে ব্যক্ত করতে গেলে যে কবির কথা ধার করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই সেই কবি-সার্বভৌমের ভাষায় 'স্মৃতিভারে'র অন্তর্নিহিত প্রেরণাটি ব্যক্ত করি,

"যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই -
যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।"

১৩৭১

শ্রীজনার্দন চক্রবর্ত্তী

প্রসঙ্গ-সূচী

বরণীয় | | পত্রাঙ্ক

মা

হিন্দু-মুসলমান

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

স্মৃতিভারে

কোলকাতার উপকণ্ঠে সদ্যো-নির্মিত সেনহাটি-উপনিবেশ থেকে প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ংবদ যুবকেরা সেদিন এসেছিলেন। তাঁদের নোতুন-গড়া অর্ধ-নাগর পল্লীসমাজের সার্বিজনীন উৎসবে স্বজনবোধে আমাকে ডাকতে এসেছিলেন। পিতৃ পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করে স্বগ্রামবাসীকে চিনতে হ'ল। কথাবার্তা শেষ করে তাঁরা চলে গেলে একটা রিক্ততার বেদনা যেন সারা মনকে নাড়া দিয়ে বার-বার একটি প্রশ্ন তুলেছিল। কোথায় গেল, কেন গেল, আমাদের আসল সেনহাটি? পল্লী-বাংলার সেই ভূ-স্বর্গ, আমাদের সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী! কার দোষে, কোন্ পাপে, তে হি নো দিবসা গতাঃ?

প্রিয়-সঙ্গমে মনটি মাঝে-মাঝে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কেন? এদেশের অনন্তজীবনবাদী কবি তার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রম্য কিছু দেখলে, মধুর কিছু শুনলে সুখী ব্যক্তিরও মন পর্যুৎসুক হয়ে ওঠে। অন্য জন্মের ভাবস্থির সৌহার্দ্যনিচয় নিশ্চয় এই বেদনাবিধুর অনুভবের উৎস। ঠিক জন্মান্তরের না হলেও দূরাগত একটি সুখস্মৃতি বেদনা-বিজড়িত হয়ে মনে জাগল। স্মৃতিলোকের সেই দুর্বার ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করবার লোভ সংবরণ করা গেল না। ঘটনাটি হয়ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু নিরবধি কাল, বিপুলা পৃথ্বী। আমার সমানধর্মা কেউ হয়ত একদিন তাতে গুরুত্ব দেবেন।

সেনহাটি-পল্লীতে ভরা বাদর মাহ ভাদরের একটি সন্ধ্যা। সেদিনের সঙ্গে আজকালের ব্যবধান প্রায় অর্ধ শতাব্দীর। একটি পোষ্যবহুল একান্নবর্তী পরিবার। রান্নাঘরে একসঙ্গে দশবারো জন পুরুষ, বালকবৃদ্ধ যুবা, নৈশ আহারে বসে গেছেন। বৃহৎ চৌরিঘর। খড়ের চালের ওপর, পিছনের কলার ঝাঁড় ও নেবুগাছের ওপর, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের রিমিঝিমি। গুরুগুরু মেঘগর্জন। অথির বিজুরি পাঁতিয়া। ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি, ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া। ভোজনরতেরা তৃপ্তিভরে আহার প্রায় সমাধা করে এনেছেন। আহারের পদাবলী সাধারণ অথচ স্বাদু, উপসংহারে অকৃত্রিম গোদুগ্ধ ও আমসত্ত্ব।

এমন সময়ে, শোনা গেল ছোটবাবু বাড়ী আছেন, ছোটকাকামশাই? 'ছোট-কাকামশাই' সাতসহোদরের সর্বকনিষ্ঠ আমার পিতৃদেব, আমাদের অঞ্চলে নাম-ডাকে ছোটবাবু। ডাক শুনে ছোটবাবু উৎকর্ণ হলেন। আজ্ঞাবহ ভাইপো-মেঘনাথকে বললেন, আঁচিয়ে শীগ্‌গির দেখে আয় তো মেঘা, এই ঘোর দুর্যোগ মাথায় করে কে এল? কে আমায় ডাকে? বড়দা-মেঘনাথ তৎপর হয়ে আদেশ পালন করলেন। বাহির বাড়ীর উঠান থেকে অন্দরের উঠানে নিয়ে এলেন বাবার হিন্দু-ভাইপো এক বর্ষণ-স্নাত বিপন্ন প্রৌঢ় মুসলমান-ভাইপোকে। এক মাইল দূরের পার্শ্ববর্তী দেয়াড়া-পল্লীর তিনি অধিবাসী।

কি সমাচার, কাসেম ভাইপো? রাত্তির বেলায় এত বড় দুর্যোগে কি মনে করে? খবর ভালো তো?—ছোটবাবু জিগ্‌গেস করলেন। আগন্তুক বললেন, একেবারে একরত্তি গ্যাদা নাটা'নে ছিমড়া-ডা কান্‌তি কান্‌তি গলা শুকিয়ে আডাট্‌ হয়ে পড়ছে। গায়ে ধা-ধা করছে জ্বর। ঘরে ওষুধ কত্তি এক ফোটা দুধ নেই। একটা মাত্র গাই। বাছুরে দুধ পিইয়ে গেছে। সকালের-দোওয়া দুধটুকুন্‌ বেচতি হয়। না হলি সংসার চলে না। এক ফোটা দুধির জন্যি কার বাড়ীই বা যাই? ভাবলাম, ছোটকাকার বাড়ী যাই। সেখানে গিয়ে কেউ কিছু চেয়ে খালি হাতে ফেরে না।

কথাটি বিপন্ন ব্যক্তি আবেগের সঙ্গে আন্তরিকতার সুরে বলে গেলেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের কাসেম মৌলভী। তাঁর বাবা ছিলেন পার্শ্ববর্তী কয়েক গ্রামে পরিক্রমা-রত একজন সুপরিচিত জনপ্রিয় ফকির। কাসেম মৌলভী আরবী-ফার্সী কিছু-কিছু শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায় প্রাণের টানে। আবার হিন্দু পড়ুয়াদের সঙ্গে মিলে একটু কলাপ-ব্যাকরণ পড়বার সুযোগও হয়েছিল তাঁর শৈশবে। পথে-ঘাটে আমাদের মতো ইংরেজি স্কুলের পড়ুয়া ছেলেকে পেলে ভাইডি-সম্বোধনে তাকে থামিয়ে নানা তৎসম শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তি জিজ্ঞাসা করতেন তিনি। আমরা এইজন্যে তাঁকে ভয় ও ভক্তি দুই-ই করতাম। মনে আছে, একদিন তিনি অল্পসময় পথে দাঁড় করিয়ে আমাকে তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রশ্ন করে মতুপ্‌ প্রত্যয়ের রকমারি বাৎলিয়ে দিয়েছিলেন, কেন দয়াবতী খদিজা বিবি, অথচ ভক্তিমতী সরমাসুন্দরী বলতে হবে। মৌলভী-সাহেব ইদানীং খুলনা জেলখানার কয়েদিদের জন্যে স্বল্পবেতনে ধর্মোপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তালি-দেওয়া ইজার-চাপকান পরে প্রসন্নমুখে তিনি সপ্তাহে একদিন করে প্রায়

পাঁচ মাইল পায়ে হেটে খুলনা-সহরে যেতেন। সৌম্য চেহারা, বেশ মানাত। চারিপাশের গ্রামসমূহের সকলেই তাঁকে চিনত মানত। আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁর কোনদিন ছিল না, তবু সবাই সম্মান করত তাঁকে। তিনি ছিলেন সদালাপী মানুষ। স্বভাব স্নিগ্ধ, মনটি উদার।

প্রাচীনপন্থী অথচ সংস্কারমুক্ত আমার পিতৃদেব জিদ করে বর্ষণ-স্নাত মুসলমান প্রতিবেশীকে রান্নাঘরের বারান্দায় বসালেন। রান্নাঘরের ভিতরে হেঁশেলের অংশে নিজে তদারক করে আবিষ্কার করলেন, দুধের ভাণ্ডার নিঃশেষ। দুধের বড়ো কড়াইটি শূন্য। গৃহিণীদের চিরদিনকার স্বভাব। ভোজনার্থীদের পাতে ভোজ্য-পানীয়ের উপাদেয় অংশ পরিবেষণ করে নিজেদের ভাগে স্বল্পাংশই রাখতেন অথবা কিছুই রাখতেন না। বাবা হায়-হায় করে উঠলেন। কিছুক্ষণ বকাবকি করে বড়ো এক তাল মিছরি নিয়ে তাঁর কাসেম-ভাইপোকে দিয়ে বলে দিলেন—বাবা, শুনলেই তো তোমার খুড়িমাদের অবিবেচনার কথা। একেবারে বে-আক্কেলে বে-বন্দোবস্ত ব্যাপার। কড়াইতে একফোটা দুধও নেই। গরম জলে এই মিছরিটুকু ভিজিয়ে বার-বার একটু-একটু করে আমার খুদে-দাদুকে খাওয়াবে। কাল সন্ধ্যাবেলায় কবিরাজ প্রিয়নাথ সেন মশাইয়ের বাড়ীতে যাবে। আমি সেখানে থাকব। আমার দাদুর জন্যে ওষুধ নিয়ে আসবে। ভয় কি? দাদু ভালো হয়ে উঠবে, আমার ফকির-ভাইদার নাতি! তিনি সবার ভালো করে বেড়াতেন। কল্যাণকর্মার দুর্গতি হয় না—গীতার এই মর্মের আশ্বাসবচনটি তিনি শ্রদ্ধালু সমঝদার মৌলভী-সাহেবের কাছে অভ্যাসবশে বলে গেলেন। মৌলভী কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

শুতে গিয়ে উসখুস করে কিছুক্ষণ পরে বাবা বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন। কিছু সময় অশান্ত পায়চারি করে তিনি তাঁর বিধবা মেঝ-বোঠান অর্থাৎ আমাদের মেঝ-জেঠিমাকে ডেকে বললেন,—মেঝ-বৌ, ছোট দুধের ঘটি আর লণ্ঠনটা নিয়ে এস তো একটু আমার সঙ্গে। এই বলে পিচের লাঠি-হাতে অদূরবর্তী মেটে গোহালঘরের দিকে এগিয়ে বাবা দরজার শিকল খুলে অতি সন্তর্পণে গোহালঘরে ঢুকলেন। সন্তর্পণে, কারণ মাঝে-মাঝে মেটে দেওয়ালের ফাটল থেকে বেরিয়ে এসে বড়ো-বড়ো দাঁড়াস্-সাপ গোরুর পা কসে পেঁচিয়ে ধরে দুধ খেয়ে যেত। গোরুরা তখন কাঠ হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকত। দশ-বারোটা বড়ো গোরু, দাঁড়িয়ে অথবা অর্ধ-শায়িতভাবে লেজ নাড়িয়ে ডাঁশ-

মশা তাড়াচ্ছে। পাঁজালের ধোঁয়ায় ও ক্ষীণ আলোকে বড়ো গোহাল ঈষদ্-আলোকিত, প্রচুর-ধূমায়িত।

দ্বিধা-বিভক্ত গোহালঘরের খোয়াড়ের ভিতর থেকে একটি বাছুর বের করে এনে জেঠিমা একটি দুধেলো গাইকে প্রথমে পানিয়ে নিলেন, পরে টেনে-টেনে দুইলেন। টেনেবুনে পোয়াটেক দুধ হ'ল। বাবার মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠল। সেই দুধ-সমেত দুধের ঘটি আর ছাতা-লণ্ঠন নিয়ে বৃদ্ধ শমিতদুর্যোগ রাতে পথে বেরুতে উদ্যত হলেন। ব্যাপার দেখে ভয়ে-ভয়ে কনিষ্ঠ ভাই ভোলানাথ আর আমি এগিয়ে এলাম, মৌলভী-সাহেবের বাড়ীতে আমরা দু'ভাই গিয়ে দুধ দিয়ে আসবার প্রার্থনা জানালাম। অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বাবলম্বী বৃদ্ধ আমাদের প্রার্থনা পূরণ করলেন, সাবধানে পথ চলবার নির্দেশ দিলেন। বর্ষণ ক্ষান্তপ্রায় হলেও দুর্যোগের রেশ ছিল। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট। সলিল-সমাহিত পঙ্কিল পল্লীপথ অতিবাহন করে কণ্টকে জরজর চরণে প্রায় মধ্যরাতে অভিসারের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হ'লাম।

বাঁশঝাড়ে-চাপা একখানি মাত্র খড়ের ঘর দরিদ্র কাশেম মৌলভীর। ঝাপের দরজা, ভিতরে মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে একটি কেরোসিনের টেমি। স্তিমিতপ্রায় দীপের সঙ্গে স্তিমিতপ্রায় শিশুকণ্ঠের ক্ষীণ ক্রন্দন। ছোট্ট পইঠার ওপর দাঁড়িয়ে হাক দিলাম,—কাসেম-ভাইদা বাড়ী আছেন? পল্লীর সংস্কার, নিশিতে এক ডাকে সাড়া দিতে নেই। দু'বার ডাক দিতে আন্তরিকতায়-ভরা ত্রস্ত কণ্ঠে জবাব এল,—কেডা? ভাইডি জোনাদ্দনের গলা মনে হচ্ছে যেন! পাশে অর্ধজাগরিত সহধর্মিণী ছিলেন বোধ হয়। তাঁকে জোরে ডাক দিয়ে বেরিয়ে এসে আমার হাতে দুধের ঘটি দেখে স্ত্রীর উদ্দেশে অনর্গল বলে চললেন আমার কাসেম-ভাইদা,—ওরে ওঠ্, ওরে দেখ্, শোন্, তোর বাড়ীতে কারা এয়েচেন ঝড়বাদল মাথায় করে! ছোটকাকার সোনার চাঁদ ছালে, এস্কলারসিশ্-পাওয়া ভাইডি, সঙ্গে ছোট-ভাইডি ভোলানাথ।

তার পরে চলল এক-দফা এই অর্বাচীনের, ক্রমায়মাণ এই এরণ্ডের প্রশংসা। আর এক-দফা আমার মহাপ্রাণ পিতৃদেবের উদ্দেশে অর্পিত অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি। স্বল্পে সন্তুষ্ট সরল কৃতজ্ঞতার সে কি মর্মস্পর্শী প্রকাশ! শুনলে আত্মাদর-পরায়ণ ব্যক্তিও কানে আঙুল দেয়। নিজমুখে পুনরাবৃত্তি করলে আত্মশ্লাঘার পাতক স্পর্শ করে। কিন্তু সে তো স্তাবকতা নয়, প্রীতি-

কৃতজ্ঞতার মধুস্রাবী সঙ্গীত। এ-কালের ভাষায় ব্যক্ত করবার মতো প্রাণ-সম্পদ্ আমার নেই।

স্বধর্মনিষ্ঠ দু'টি মানুষের যথার্থ চিত্র এখানে এঁকেছি। অতিরঞ্জন করিনি এতটুকু। অতিরঞ্জনের সাধ্য কি সেই সহজ সত্যের স্ব-মহিমাকে অতিক্রম করে? সেনহাটি-গোয়ালপাড়ার ব্রাহ্মণ-অধিবাসী আমার পিতৃদেব লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন, পার্শ্ববর্ত্তী দেয়াড়া পল্লীর মুসলমান অধিবাসী কাসেম মৌলভী আর একজন। সাধনোচিত ধামে চলে গেছেন সেই দুই হিন্দু-মুসলমান। কি নিষ্ঠুর নিরঙ্কুশ ভাঙা-গড়া মহাকালের! বাংলার হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত সম্পর্কের প্রত্যক্ষদর্শী, অধুনা স্বাধীনভারতের নাগরিক,

"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

এলাহি ভরসা

এই শতাব্দীর প্রথম দশকের ঘটনা। বর্ধিষ্ণু হিন্দুপল্লীর ব্রাহ্মণ গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসে। পাঠশালার গুরুমশাই ছাত্রবৃত্তি-পাশ প্রৌঢ় মুসলমান। গৌর কান্তি, মুখে পাতলা গোঁফ-দাড়ি। সকালে-বিকালে দুবেলা পাঠশালা বসে। সকালে ছোটদের তালপাতায় আর বড়োদের কাগজে লেখা ও ঘোষিয়ে নামতা-পড়া। বিকালে বই-পড়া ও শ্লেটে অঙ্ক-কষা। সকালে লিখনম্, বিকালে পঠনম্, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজনে চ জনার্দনম্ আর অব্যবহিত পরেই শয়নে পদ্মনাভঞ্চ।

চণ্ডীমণ্ডপ মেটে-দেওয়াল, সুমুখ-খোলা দক্ষিণদুয়ারি ঘর। সামনের প্রশস্ত বারান্দার প্রান্তভাগ শান-বাঁধানো। সারি সারি শালের খুঁটির ওপর টিনের ঝালরকাটা চাল। অপর তিন পোতায় বড় বড় টিনের ঘর। পূবে-পশ্চিমে লম্বা নাকারি-ঘর, যাত্রাগানের সময়ে প্রতি ঘরে দুশো করে লোক বসতে পারে। দক্ষিণে পেটকাটা ঘর। তার দুদিকে দুটি কক্ষ, মাঝখানে যাতায়াতের পথ, উপরে একই ঢেউটিনের চাল। চকের মাঝখানে বহির্বাটীর প্রশস্ত অঙ্গন—যাত্রার আসর এবং উৎসবে পালপার্বণে শত শত নিমন্ত্রিতের পংক্তি-ভোজনের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত! পূজা-অর্চনা এবং উৎসবাদির সময় পাঠশালা বন্ধ থাকে। ঘরগুলি বারোমাস লেপাপোছা তক্তকে থাকে। ঘাসে-ঢাকা উঠানটি, ছেলেদের নানাবিধ দেশী খেলার দাড়ি-কাটা। ভোজ ও যাত্রাগানের সময় পরিষ্কার করে চাছা হয়।

পাঠশালায় স্থায়ী আসবাবের বালাই নেই। একখানিমাত্র জলচৌকি, গুরুমহাশয়ের নাতিক্ষুদ্র সমুচ্চ সম্মানিত সুখাসন। পিছনের শালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে গুরুমশাই সেই চৌকিতে আসন গ্রহণ করেন। সেখানে উপবিষ্ট অবস্থায় কখন কখন তাঁর তন্দ্রাকর্ষণ হয়। পাঠশালা-পরিদর্শক এলে কোনও বাড়ী থেকে ধার করে একখানি চেয়ার এনে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা হয়। পড়ুয়ারা তালপাতায় রচিত ছোট-ছোট চাটখোলে বসে, দড়ি বেঁধে আঙুলে ঝুলিয়ে নিজ নিজ আসন নিয়ে আসে, আবার বাড়ী নিয়ে যায়। উপরের

শ্রেণীর পড়ুয়ারা দু'দিকে ইট পেতে তারপর একখানি তক্তা রেখে তাদের 'ফাস্ট' কেলাস' নির্মাণ করে। মাঝে-মাঝে নিজেদের মধ্যে কলহ করে তক্তার মালিক 'কেলাস' মাথায় বয়ে বাড়ী নিয়ে যেত—'কেলাস' শব্দটি তারা বেঞ্চির পরিবর্তে ব্যবহার করত। এই সর্দার পড়ুয়ারা শ্লেটে কষি টেনে বাঁ-দিকে লিখত শব্দ, ডান-দিকে অর্থ, যেমন, শৃগাল, অর্থ জম্বুক। আক্রমণ, অর্থ তেড়ে গিয়ে ধরা। তারা মিশ্র ভাগ শেষ করে কাঠা-কালির আঁক কষত। পলাতক পড়ুয়াকে ধরে আনবার জন্য গুরুমশাইয়ের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে তারা বাড়ী-বাড়ী অভিযান চালাত। তাদের বিদ্যা ও প্রতাপের পরিমাণ দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ভাবতাম,—আমরা কি কোনদিন অতদুর পৌঁছুতে পারব?

শীতকালে গৃহনির্মাণের হিড়িক পড়ে যায় গ্রামদেশে। তখন মাঠে অনেক তালগাছ কাটা হয়। নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরের খুঁটি, চালের কাঠামো, দরজার চৌকাঠ তালকাঠের সস্তা উপকরণে তৈরি হত। পড়ুয়ারা চেয়ে-চিন্তে তালপাতা সংগ্রহ করে ডেগো ধরে টেনে বাড়ী নিয়ে যেত। পাতাগুলি ডেগো থেকে ছাড়িয়ে আটি বেঁধে পুকুরে পাঁকের নীচে ভিজিয়ে রাখা হত ক'দিন। তারপরে তুলে রোদে শুকিয়ে দড় হলে তাতে লেখা হত। খোলা ছুরির গোড়া দিয়ে তাতে আখর বসিয়ে আদর্শলিপি প্রস্তুত করে দিতেন গুরুমশাই। মুক্তার পাঁতির মতো ছিল তার হস্তাক্ষর। তালপার শড়া বা বেষ্টনী দিয়ে তালপাতার আটি বা পাততাড়ি বাঁধা হত। তালপাতায় রচিত চাটখোল মাটিতে বিছিয়ে পড়ুয়ারা বসত।

কুম্ভকার-প্রতিবেশীরা পুঁইশালে হাঁড়িকুড়ির সঙ্গে ছোটছোট মেটে দোয়াত পোড়াতেন। পুঁইশালে যেদিন পোড়া গড়ন খোলা হত সেদিন বিদ্যার্থী বাল-খিল্যেরা এসে ভিড় জমাত। মৃৎশিল্পীরা হাসিমুখে বিনামূল্যে তাঁদের মধ্যে দোয়াতগুলি বিলিয়ে দিতেন। দামের প্রত্যাশা তাঁরা করতেন না, দিতে গেলেও সলজ্জভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। পড়ুয়াদের কলম তৈরী হত বাঁশের ঝাঁড় থেকে কঞ্চি কেটে। লিখবার কালি হত আঙ্গারি বা অঙ্গার থেকে। আগুনের মালসায় যে পোড়া কাঠকয়লা বা আঙ্গারি থাকত তা গুঁড়িয়ে বেটে ছেকে নিয়ে কালি তৈরি করে দিতেন বাড়ীতে মায়েরা। এইভাবে বিনা খরচে প্রাথমিক বিদ্যাভ্যাসের যাবতীয় উপকরণ আহৃত হত।

পাঠশালার বেতন অতিসামান্য, যদিও তা গুরুমশাইয়ের জীবিকার মুখ্য উপায়। এই বেতন আবার বাধ্যতামূলক ছিল না। না দিলেও গুরুমশাইকে ক্ষুণ্ণ হতে দেখিনি কোনদিন। পালপার্বণে দু'একটি ঝুনো নারিকেল, বছরে একখানি মোটা ধানের ধুতি বা এই জাতীয় কিছু পেলেই কত খুসী হতেন গুরুমশাই। মাঝে-মাঝে ছেলেরা তাদেরই কলম-পেনসিল কাটবার উপযোগী স্বল্পমূল্যের ছুরি কিনবার জন্যে গুরুমশাইকে দু'এক আনা করে পয়সা দিত। গুরুমশাইয়ের চিত্তের প্রসাদ ছিল নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো অবিক্ষুব্ধ। কেবল যে-সমস্ত পড়ুয়া অশান্ত অথবা পরম-দুর্মেধাঃ তাদের কর্ণধারণপূর্বক ইতস্ততঃ সঞ্চালনকালে গুরুমশাইয়ের গৌর আননশ্রী ঈষৎ ক্রোধারুণ হয়ে উঠত। আর রাঙামূলো, ভিজেবেরাল, ত্যালাচোরা প্রভৃতি সুনির্বাচিত পারিভাষিক বিশেষণ অতর্কিতে উচ্চারিত হয়ে পড়ুয়াদের অন্তরে ভীতি কৌতুক অনুতাপ প্রভৃতি বিচিত্র বিমিশ্র ভাবের সৃষ্টি করত।

তখন শরৎকাল। মেঘভার-বিনির্মুক্ত সুনীল আকাশ। চারিদিকে সোনালি কিরণ ঝলমল করছে। অতসী অপরাজিতার শোভা, শিউলির সৌরভ, ভিক্ষাজীবী প্রভাতী-গায়কের কণ্ঠে আগমনী গান পাঠশালার কিশোর পাঠার্থীকে আন্‌মনা করে দিচ্ছে। মুসলমান গুরুমশাইও দূরাগত আগমনীর সুরে কান পাতছেন। পড়ুয়াদের পাতালেখা শেষ হল। হাতে কালি, মুখে কালি, রূপনাথ ভূতনাথ দেবনাথেরা তখন ঘোষিয়ে নামতা পড়া শুরু করল। "আঠারো কুড়িং তিনশো ষাট্, উনিশ কুড়িং তিনশো আশী", বলা শেষ হতেই তারা হাতের আঙুল মটকিয়ে শঙ্খমুদ্রা রচনা করল এবং "কুড়ি কুড়িং চার শো" বলেই সমস্বরে 'গুরুমশাই সম্মান'-মন্ত্রে গুরুপ্রণাম সমাধা করে খচমচ শব্দে পাততাড়ি গুটিয়ে পিটটান দেবার উপক্রম করল। গুরুমশাইও অভ্যাসবশে প্রতিদিনকার মতো "যা সব, ও-বেলা সকাল সকাল আসিস্" এই বলে সেদিন একটি বিশেষ ঘোষণা করলেন যা আমার পক্ষে বিশেষভাবে অপ্রত্যাশিত ও অতীব গৌরবজনক।

ঘোষণাটি হল এই, পরদিন আমার কাগজ-ধরা। তালপাতা পর্বের অবসান। নোতুন কাগজ কলম দোয়াত কালি নিয়ে নোতুন কাপড় পরে আসতে হবে। বাড়ী গিয়ে যেন বাবাকে জানাই, ঠিকমত যেন সব ব্যবস্থা হয়। উল্লম্ফনের পর উল্লম্ফন দিয়ে বাহির বাটীর পাঠশালা থেকে ত্বড়িদ্‌গতিতে বাড়ীর ভিতর গিয়ে

তারস্বরে এই শ্লাঘনীয় কৃতিত্ব ও পদবৃদ্ধির বার্তা বিঘোষিত করলাম। স্নানের জন্য পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে সেদিন সাঁতারের নানা কারসাজি দেখিয়েছিলাম।

"ঙ-ক'য়ে আঙ্ক" "স-য় ক-য়ে আস্ক" নির্ভুল ও পরিষ্কার করে তালপাতায় লিখতে শিখেছি। বঙ্কিমচন্দ্র, ব্রহ্মবিদ্যা, বেদজ্ঞ, বাঞ্ছনীয় প্রভৃতি যুক্তাক্ষর-সম্বলিত শব্দ লিখতে গিয়ে আমরা তখনকার পাঁচ বছরের পাঠশালার পড়ুয়ারাও বিপর্যয় বাধিয়ে বসতাম না। গুরুমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন প্রতি পাঠার্থীর লিখন-পঠনের অগ্রগতির প্রতি, তাই কালবিলম্ব না করে উপযুক্তকালে আমার তালপাতা-পর্বের অবসান এবং কাগজ-ধরার শুভ সমারম্ভ ঘোষণা করলেন। সারাদিন আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি বা উদ্যোগপর্ব চলল। সংগৃহীত উপচারের তালিকা ও দ্রব্যমূল্য যতদূর মনে পড়ে দেওয়া হ'ল। এক পয়সা মূল্যের তিনটি লাল বেলে কাগজ। দু-পয়সা মূল্যের একটি কাঁচের বোচনো-দোয়াত—যা উপুড় করলেও কালি পড়েনা। এক পয়সার একটি পাখির পালকের 'পেন্-কলম', যা পাঠশালায় গেলে গুরুমশাই নিজে প্রয়োজনমত সরু অথবা মোটা করে কেটে তৈরি করে দেবেন। এক পয়সায় তিনটি জে. বি. ডি.'র কালির বড়ি। এতদিন সারস্বত সাধনার এইজাতীয় উপাদান প্রকৃতির ও প্রতিবেশীর দাক্ষিণ্যে বিনামূল্যে আহৃত হয়ে এসেছিল। আজ সর্বপ্রথম সর্বসাকল্যে চার দফে পাঁচটি নগদ পয়সা খরচ হয়ে গেল।

এর পরে সংগৃহীত হল গুরুবরণের যৎকিঞ্চিৎ উপচার। মোটা থানের ধুতি একখানি, কিছু-কমবেশি এক টাকার মূল্যের। সাদা চাদর একটি, দশবারো আনা দাম। এই হল গুরুবরণের জোড়, ধুতিচাদর। গুরুদক্ষিণা, মহারাণী ভিকেটারিয়া-মুদ্রাঙ্কিত চাঁদির গোটা টাকা একটি, পূর্ণ রজতখণ্ড। তিন-চার আনা মূল্যের পেতলের রেকাবি একখানা। তাতে গুরুর নৈবেদ্য। এক টাকার সন্দেশ—গোল-করে-পাকানো বত্রিশটি+ফাউ একটি। অর্ধশতাব্দীর কিছু-বেশি আগেকার বাজারদর এটি, প্রাগৈতিহাসিক কালের নয়।

ভালো ঘুম হল না আমার, আগের রাতে। বাবার কাছে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি। মাঝে মাঝে বাবা জিগ্গেস করেন, কিরে, উসখুস করিস্ কেন রে? ঔৎসুক্যে অর্ধনিদ্রায় অনিদ্রায় রাত কেটে গেল। পূবে ফরসা দেয় নি ভালো করে। দোয়েল-ফিঙে আর দু'একটি প্রভাতী কাক দিনমণির আগমনী গাইতে শুরু করেছে। এবার কাঁদ-কাঁদ সুরে বলে উঠলাম। বাবা, সকাল যে হয়ে

এল ! আমার দুঃখের কারণ বুঝতে না পেরে বাবা বললেন, তাতে কি হয়েছে ? তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ভ্যা-ক করে কেঁদে দিলাম। আ মা র যে আ জ কা গ জ-ধ রা ! বাবা বললেন। তা তো ধরবি। সকাল হোক, এখনও তো বাইরে আঁধার। কান্নার রেশ টেনে অনুনয়ের সুরে বললাম, গুরুমশাই যদি আজ পাঠশালায় না আসেন !

মুসলমান গুরুমশাই নিজ হাতে জমি চাষ না করলেও লোকজন রেখে দু'একখণ্ড জমি চাষ-কারকিৎ করাতেন। মাঝে-মাঝে পূবের-বিলে যেতেন অতি প্রত্যূষে জমিজমার তদারকের জন্যে। এমন সব দিনে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে পাঠশালার ছুটি হয়ে যেত। অনধ্যায়-জনিত মুক্তির আনন্দে বালখিল্যেরা বাড়ী গিয়ে নানা দৌরাত্ম্য করত। আমার ভয়, আজ যদি আমার দুরদৃষ্টবশতঃ তেমন দুর্ঘটনা ঘটে ! তা হ'লে সাথী-সঙ্গীর মুক্তির আনন্দ আমার নিদারুণ আশাভঙ্গের হতাশায় পরিণত হবে।

বাবা শয্যাত্যাগ করলেন কিছু আগেই। তাঁর অভ্যস্ত আবৃত্তি শুরু হ'ল—প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রাম্ অনুবর্তয়িষ্যে ইত্যাদি। তাঁর উদাত্ত-মধুর কণ্ঠে দুর্গানাম উচ্চারিত হতে শুনলাম—প্রভাতে যঃ স্মরেন্ নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা। বাবার তদানীন্তন অনুভব আমার ধারণাগম্য না হলেও যেন পিতৃচিত্তের একটি আকৃতি অস্পষ্টভাবে আমার অন্তর স্পর্শ করল—জ্ঞানসূর্যোদয়ে তাঁর সন্তানের অজ্ঞানতমঃ যেন বিদূরিত হয়। দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে অভ্যস্ত স্নানপূজাদি নিত্যকর্ম স্থগিত রেখে আমার আজকার নৈমিত্তিক কর্মে অবহিত হয়ে বললেন,—চল্, তোকে নিয়ে একেবারে গুরুমশাইয়ের বাড়ী গিয়ে কাগজ ধরিয়ে আনি। বায়না যখন ধরেছিস্, তখন তো ছাড়বি-নে। পাঠশালা বসা পর্যন্ত তোর তো ত্বর সইবে না !

পিতাপুত্র যাত্রা করলাম আমার গুরুগৃহের অভিমুখে ব্রাহ্মমুহূর্তের আলো-আঁধারে। সেনহাটির গোয়ালপাড়ায় আমরা প্রায় পঁচিশ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করি। বসতির বড়ো শৃঙ্খলা সাজানো সুবিন্যস্ত সেনহাটি গ্রামে। বৈদ্য-কৌলীন্যের একটি মুখ্য আদিপীঠ সেনহাটি। কিন্তু ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এক-একটি জাতির এক-একটি বংশ এবং তার শাখাপ্রশাখা নিয়ে গ্রামের এক-একটি পাড়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাই ব্রাহ্মণদের সর্ববিদ্যাপাড়া, বিদ্যাবাগীশপাড়া, সিদ্ধান্ত-

পাড়া, কাজড়িপাড়া ইত্যাদি। বৈদ্যদের হিঙ্গুপাড়া, গণপাড়া, ধন্বন্তরিপাড়া। কায়স্থদের মৌস্তফিপাড়া, দত্তপাড়া। ফাঁকে-ফাঁকে নবশাখদের, কুমোর, কামার, ছুতোর, তেলিভাইদের পাড়া। দূরে মাঠের ব্যবধানে ছোট ছোট পল্লীতে মুসলমানভাইদের বাস, দেয়াড়া দিঘলিয়া পানিগাতি ব্রহ্মগাতি বাতিভিটা বগদিয়া প্রভৃতি গ্রামে।

ছয় বছর বয়সে জীবনে এই প্রথম বাবার সঙ্গ ধরে পল্লীর একটি বৃহদংশ পরিক্রমা করে মুসলমান পল্লীতে গুরুমশাইয়ের বাড়ী পর্যন্ত যাবার সুযোগ পেলাম। শঙ্কামিশ্রিত কৌতূহল ও অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে বুক দুরু দুরু করতে লাগল। ব্রাহ্মণপাড়া অতিক্রম করে বৈরাগীদের পল্লীতে উপস্থিত হলাম। উষার আলো-আঁধার, শিশিরভেজা ঘাসের স্নিগ্ধসজল স্পর্শ। তার সঙ্গে সদ্যঃ-প্রবুদ্ধ শ্রীদাম বৈরাগীর কণ্ঠে শ্রুত প্রভাতী কীর্তন,

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম হে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে জন আমার প্রাণ হে॥

সবকিছু মিলে এক অব্যক্তমধুর রহস্যগভীর অনুভব জেগেছিল সেদিন আমার প্রাণে। কিছুদূর এগিয়ে শুনলাম, পৃথক্ বাড়ীতে শ্রীদামের অগ্রজ কোমলদাস বৈরাগী প্রার্থনার প্রাণদ্রাবী পদ গাইছেন,

ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন
অভয়-চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত-আতপ বাত-বরিখন
এ দিন-যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে॥

ভজন-প্রবীণ বৈরাগী বুঝি প্রতিবেশি-কিশোরের সদ্‌গুরুসঙ্গের সুদুর্লভ সৌভাগ্যের সূচনা করলেন! বেহারাদের পল্লী তখনও সুপ্ত। কাঠের বড়ো বড়ো পাল্কি টাঙানো রয়েছে তাদের ঘরের দাওয়ায়—যাতে চড়ে যাওয়া-আসা করেন পল্লীর নোতুন বৌয়েরা, কচিৎ অভিজাত পল্লীবৃদ্ধ অথবা পদস্থ রাজকর্মচারী।

দেখতে-দেখতে গ্রামের প্রত্যন্তভাগে ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লীতে এসে পড়া গেল। গুরুমশাইয়ের পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপর এসে একটা উদাত্ত-গম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। সর্বনাশ, এ-যে গুরুমশাইয়েরই কণ্ঠ! কিন্তু এমন মধুর আবৃত্তি নামতাপাঠের সময়ও তাঁর কণ্ঠে শুনিনি। মনে হল, যেমন ঠাকুরঘরে পূজোয় বসে বাবা দৈনন্দিন সপ্তশতী চণ্ডী বা গীতা পাঠ করেন গুরুমশাইও তেমন চণ্ডী-পাঠ করছেন। তাই সরল বিশ্বাসে বাবাকে প্রশ্ন করলাম,—বাবা, গুরুমশাই কি চণ্ডীপাঠ করছেন? বাবা হেসে বললেন,—ঠিক চণ্ডী নয়, তবে ওঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানশরীফ্ পাঠ করে আজান দিচ্ছেন। "আল্লাহঁ আকবর"—আমার প্রথম শ্রুত সেই আজানের ধ্বনি সেদিন গুরুমশাইয়ের কণ্ঠোত্থ হয়ে বড় মধুর চিত্তদ্রবকর মনে হয়েছিল।

আমাকে নিয়ে বাবা কিছুসময় অপেক্ষা করলেন পুকুরপাড়ে। শুপারির পাতায় রচিত বেড়া আবরু-রচনা করেছিল আমার গুরুগৃহের অন্তঃপুরভাগের। আজানের সুর থেমে গেলে কিছুকাল ইতস্ততঃ করে বাবা গলায় খাঁকার দিলেন। পল্লীতে গলায় খাঁকার-দেওয়া কতকটা নাগর সভ্যতায় দর্শনার্থীর কার্ড-পাঠানোর মতো ব্যাপার। পরিচিত কণ্ঠের খাঁকার। শুনে গুরুমশাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। সম্ভ্রম ও আন্তরিকতায় ভরা হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি সমাচার, ছোটবাবু? এত ভোরবেলায় কি মনে করে? এই বলেই বাবার পিছন দিকে আমাকে এবং আমার হাতের দ্রব্যসম্ভার দেখে সব অনুমান করে নিলেন আমার ছাত্রবৎসল গুরুদেব। সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে আমাকে বললেন,—বাবাকে একেবারে ধরে নিয়ে এসেছ গুরুমশাইয়ের বাড়ীতে? তা বেশ করেছ, বাবাজী। আজ আমার পাঠশালায় যেতে বেশ একটু দেরি হত। আজ একটু পূবের বিলে জমি-তদারকে যাবার কথা ছিল।

বাবা বললেন,—"তাই বুঝি তোমার সাকরেত বায়না ধরেছিল রাত না পোহাতেই! গুরুমশাই, তোমার ছাত্রের হাত থেকে এই সামান্য গুরুদক্ষিণা গ্রহণ কর। এখানেই তাকে আশীর্বাদ করে কাগজ ধরিয়ে দাও।" গুরুমশাই প্রসন্নমনে হাসিমুখে হাত পেতে ধুতিচাদর ও টাকাটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু সন্দেশের আধারটি আধেয় সহ পাঠশালায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। বাবা দু' একবার পীড়াপীড়ি করে বললেন,—এগুলি তোমার ছেলেমেয়ের জন্য এনেছি, গুরুমশাই। তাদের দিয়ে দাও। গুরুমশাই তাঁর

ছাত্রকে-দেওয়া পূর্বনির্দেশ বহাল রাখলেন। কেন, তা তখন বুঝতে পারি নি। পরে পাঠশালায় ফিরে বুঝলাম। সেই সঙ্গে গুরুমহিমা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করলাম।

আমাদের তিনজনের একটি ছোট শোভাযাত্রা পল্লীপথ বেয়ে গুরুমশাইয়ের বাড়ী থেকে পাঠশালা অর্থাৎ আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের অভিমুখে চলল। অগ্রে পশ্চাতে আমার পিতৃযুগল, মাঝখানে উপকরণ-পাণি আমি, একের আত্মজ, অপরের জ্ঞানজ সন্তান। একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান। আমরা ত্রয়ী-মূর্তি যখন পাঠশালা গৃহে উপনীত হলাম তখন সে গৃহ কালিদাস-বর্ণিত নীড়ারম্ভে গৃহবলিভুক্-বায়স-সমাকুল গ্রামচৈত্যের শোভাধারণ করেছে। আমাদের তাৎপর্যপূর্ণ আভির্ভাবে অকস্মাৎ সারস্বত-কাকলীর ঐকতান স্তব্ধ হল। সমাগতপ্রায় উৎসবের প্রত্যাশায় প্রতিটি অন্তর আন্দোলিত হয়ে উঠল। বিদ্যার্থিবৃন্দ আসন ছেড়ে পাঠশালা গৃহে প্রবিষ্ট প্রবীণ-যুগলকে—গৃহস্বামী ও শিক্ষাদাতা উভয়কে—অভিবাদন জানাল।

বাবা বললেন,—গুরুমশাই, বস। গুরুমশাই বললেন, ছোটবাবু, বসুন। কিন্তু কে কোথায় বসবেন? পাঠশালায় জলচৌকি মাত্র একখানি। দ্রুত সৌজন্যবিনিময় হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হল। সমস্যার সমাধানকল্পে বাবা একটি আইনের ব্যাখ্যা দিলেন। ব্যবহারজীব ছিলেন তিনি বৃত্তিতে। তিনি বললেন,—গুরুমশাই, তুমিই বস। বাড়ী আমার,আতিথেয়-তার অধিকারও আমার। আমি বলছি, তুমিই বস। গুরুমশাই হার মানলেন না এই আইনের ব্যাখ্যায়। নিরপেক্ষতার জন্য তাঁর পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামে খ্যাতি ছিল। তাঁকে অনেক জায়গায় সালিশি করতে হ'ত। ব্যবহারাজীব না হয়েও ব্যবহারশাস্ত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন। হিন্দুপল্লীতে অবসর-প্রাপ্ত জিলাজজ, জিলাম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির সমান আসনে বসে গুরুমশাই অনেক সঙ্গীন হাইকোর্ট-ফেরৎ মামলার সুবিচার ও সালিশি নিষ্পত্তি করে দিতেন। সে নিষ্পত্তি হিন্দুমুসলমান সবাই নতশিরে মেনে নিত। তাই আমার গুরু-মশাই আইনে একেবারে অপটু ছিলেম না। বাবার কথার উত্তর আইনের ভাষাতেই তিনি দিলেন। —ছোটবাবু, আইনে আপনার দখল আমার চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু আপনি কি করে ভুলে গেলেন, কায়েমি স্বত্বের চেয়ে দখলি স্বত্ব বলবৎ। বাড়ী আপনার। কিন্তু পাঠশালা-ঘরের দখল আমার। সুতরাং

আতিথেয়তার অধিকার আমারই। আমি বলছি,—আপনি বসুন। মনে আছে, আমরা ছোটরাও সেদিন প্রবীণযুগলের সেই সৌজন্য-পরিপ্লুত আইন-ঘটিত উদার উজ্জ্বল পরিহাস-রসিকতার সবটুকু না বুঝেও প্রাণ খুলে হেসে ছিলাম। খাটি দেশী রসিকতা দেশ থেকে আজ কোথায় চলে গেল ?

গুরুমশাইয়ের নির্দেশে একজন পড়ুয়া ছুটে গিয়ে আমাদের বাড়ীর ভেতর থেকে একখানি চেয়ার নিয়ে এসে বাবাকে বসাল। তখন গুরুমশাই নির্দেশ দিলেন আমাকে, সেই সন্দেশের রেকাব থেকে নিজ হাতে সাথী সঙ্গীদের মধ্যে সন্দেশ বিতরণ করতে। এখন বুঝতে পারলাম, আমাদের ত্যাগী নির্লোভ গুরুদেব কেন নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে এই উপচার গ্রহণ না করে পাঠশালায় ফিরিয়ে আনতে বলেছিলেন আমাকে। পরিবেশন ও বিতরণের আনন্দ আমাকে অভি-ভূত করেছিল। মধুরাস্বাদে পরিতৃপ্ত পাঠার্থি-বন্ধুদের প্রীতি ও সদিচ্ছা নিশ্চয়ই আমার আত্মিক কল্যাণসাধন করেছিল, আমার সারস্বত জীবনের সেই শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্তে—যা ছিল গুরুমশাইয়ের অভিপ্রেত। আমিও শিক্ষণব্রতী। তাই মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, আমার এই গুরুমশাইয়ের উত্তরাধিকার কি আমাদের মধ্যে বর্তেছে ? আচার্য আমরা, আচরণ দিয়ে সত্যকে কি তুলে ধরতে পেরেছি আমরা এ-কালে ?

এইবার আসল উৎসব—আমার কাগজ-ধরা। গুরুমশাইয়ের আদেশে বাবাকে, এবং বাবার আদেশে গুরুমশাইকে যথাক্রমে প্রণাম ও আদাব জানা-লাম। দুই গুরুই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বেলে কাগজটি গুরু-মশাই সমান্তরাল করে ভাঁজ করলেন, যাতে কষি টানতে না হয়। এক পংক্তিতে লিখে দ্বিতীয় পংক্তি বাদ দিয়ে তৃতীয় পংক্তিতে আবার লিখতে হবে, ই-কার উ-কার প্রভৃতির টান মাঝের পংক্তিতে ধরাতে হবে, তার পরে গুরু-মশাই নতুন পেন্‌কলমটি নিজের ছুরি দিয়ে নাতিসূক্ষ্মাগ্র করে কেটে নিলেন। নোতুন দোয়াতের নোতুন কালিতে নোতুন কলম ডুবিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। পরে কাগজের শিরোদেশে ধীরে ধীরে লিখলেন, এ লা হি ভ র সা, তাঁর নিজের প্রাণের কথা লিখে একটু মাথা নোয়ালেন।

তারপরে সেই পংক্তি মুড়িয়ে দিয়ে মুক্তার পাঁতির মতো পরিষ্কার নির্ভুল করে লিখলেন, শ্রী দু র্গা শ র ণ ম্। লিখে সস্নেহ মুষ্টিতে আমার হাত ধরে শ্রীদুর্গা শরণম্-এর সমস্তটার উপর একবারআমার কলম ঘুরিয়ে আনলেন। স্নেহপূত সেই

স্পর্শ আমার অঙ্গে রোমাঞ্চের সঞ্চার করেছিল। তার পরে আরও অতিরিক্ত পাঠ লিখেছিলেন সেবকশ্রী............অথবা মহামহিম ... .এই-জাতীয়। স্মৃতিভ্রংশ-বশতঃ জীবন-সায়াহ্নে সে কথাগুলি মনে নেই। তবে গুরুমশাইয়ের অবিস্মরণীয় ক'টি কথা সেদিন বুকের পাঁজর কেটে লেখা হয়ে গিয়েছিল। সেই কথাগুলি এই।

বাবাজী, প্রথমে আমি যা লিখেছি, এলাহি ভরসা, ও-টি আমার কথা। ও-টি তুমি লিখবে না। পরে যেটা লিখেছি, শ্রীদুর্গা শরণম্, ঐ-টিই তুমি লিখবে। সব-কিছু লিখবার আগে ঐ-কথা দিয়ে আরম্ভ করবে। তুমি যে-বংশে যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছ তাঁদের ইষ্ট ঐ মন্ত্রে। তাই ও-টি তোমার। প্রথম কথাটি অর্থাৎ এলাহি ভরসা আমার, দ্বিতীয় কথাটি অর্থাৎ শ্রীদুর্গা শরণম্ তোমার। কিন্তু বাবাজী মনে রেখো, দুটি কথাই এক। অর্থাৎ গুরুমশাইয়ের সেদিনকার প্রতিপাদ্য ছিল,

এলাহি ভরসা = শ্রীদুর্গা শরণম্।

সারস্বত সাধনায় আর একটু অগ্রসর হয়ে বীজগণিতের সমীকরণ শিখেছিলাম। কিন্তু আমার ইস্‌লামধর্মাবলম্বী পরমতসহিষ্ণু রুচিমান্ উদার ছাত্রবৎসল গুরুমশাইয়ের শেখানো প্রথমতম সমীকরণ তাঁর মতো করে আজ কে শেখাবেন এই দেশে? রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজু-কুটিল-নানাপথজুষাং-নৃণাম্ একোগম্যস্ত্বমসি পয়সাম্ অর্ণব ইব। স্বাধীন ভারতে বসে ভাবছি আজ, আমার মুসলমান গুরু আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক দেশেরই মানুষ। সেই ভারত কোথায়? সে মানুষই বা কোথায় গেল?

বুড়ো ছেলে

খুলনার রাঙ্গেমারি-আবাদের অধিকাংশই ইদানীং নদীগর্ভস্থ হয়েছিল। রাঙ্গেমারির গোলদারদের সঙ্গে ভাগে বাবা কিছু এক-ফসলি ধানের জমি কিনেছিলেন। ঐ জমি নিয়ে ক'বছর মামলা-মোকদ্দমা চলছিল আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের মোল্লাদের সঙ্গে। সঙ্গিন মামলা। দীর্ঘকালেও নিষ্পত্তি হয় নি। মাঝে মাঝে দু'পক্ষের প্রজা ও বর্গাদারদের মধ্যে ছোটখাটো কাজিয়া-দাঙ্গা ঘটে যেত। একবারে শীতকালে বাবা আবাদে গিয়ে দীর্ঘকালের মধ্যে বাড়ী ফেরেননি বা খোঁজখবর পাঠাননি। একটা চাপা গুজব রটে গেল, ছোটবাবু আবাদে খুন হয়ে গেছেন। একদিন শেষরাতে সর্বনাশা সেই গুজব মিথ্যা করে দিয়ে, 'জয় রামনারায়ণ শ্রীমধুসূদন' গাইতে গাইতে বাড়ী এসে হাজির হলেন ছোটবাবু (নামডাকে) আমার পিতৃদেব।

আমাদের বসতবাড়ীর উত্তরে পুকুর। তার উত্তরে নিচু ধানের জমি—কান্দোর। বর্ষাকালে ও প্রথম শীতে সেখানে জল থাকে। তার উত্তরে সারি সারি সাজানো আমবাগিচা, চারিদিকে নক্সা করে পোতা আমগাছ, মাঝখানে তৃণাচ্ছন্ন প্রশস্ত ক্ষেত্র। শুধু আমাদের নয়, ক'টি পরিবারের বৃহৎ আম-বাগিচা পাশাপাশি যেন পল্লীর উত্তরসীমান্ত রচনা করে শীতের কন্‌কনে হাওয়া রুখছে। তার উত্তরে, পূবে-পশ্চিমে বাঁশঝাড়। সবার উত্তরে বহুশত বিঘা ধানের জমি, তার সমান্তরালে নিচু জলা জমি। তার বহুলাংশ প্রশস্ত বিল বা বদ্ধ জলাশয়। হয়ত প্রাচীন নদীগর্ভের অবশেষ—বারোমাস জল থাকে। কাকচক্ষু রৌদ্রপক্ক সুনির্মল সুশীতল জল, মাঝে-মাঝে ধাপে ঢাকা। বিকালে বাতাসে জলের ওপর কাঁপুনি বয়ে যায়। সুতের কূল বা বড়ো বিল বলা হ'ত এই জলাশয়কে। এই বিল বা বাওড়ের উত্তরে কায়স্থপল্লী কুণ্ডুপাড়া, কৈবর্তপল্লী দাসপাড়া, তার পশ্চিমে মুসলমানপল্লী দেয়াড়া দিঘলিয়া, পূবে ব্রহ্মগাতি, পানি-গাতি লাখোহাটি প্রভৃতি। ঈশানে বিশাল শিবানন্দ-দীঘি ও ৺বিজয়াচণ্ডীতলা বা শীতলাতলা। প্রসিদ্ধি আছে, তান্ত্রিক সাধক সর্বানন্দ মেহারে সিদ্ধিলাভ করে সেনহাটি এসে দারপরিগ্রহ করে এখানে নিভৃত সাধনার জন্যে আসন পেতে-

ছিলেন। তাঁর বংশধরদের একটি শাখা সেনহাটি সর্ববিদ্যাপাড়ায় বাস করছিলেন।

বিজন বটবাটিকায় প্রত্যহ বিজয়াচণ্ডী, শীতলা, বসন্তারি প্রভৃতি গ্রামদেবতার পূজা হয়। পার্শ্ববর্তী বহুপল্লী হতে অসংখ্য নরনারী সেই মুসলমান-পরিবৃত ও মুসলমান-রক্ষিত হিন্দু দেবস্থলীতে পূজা দিতে আসতেন। স্থানটি মুসলমান-ভাইয়েরা এমন ভাবে আগলাতেন যে, সেই প্রচ্ছায়শীতল মনোভিরাম কুঞ্জগৃহের একখানি গাছের ডালও কেউ কাটতে পারত না। শিকড়ে-শিকড়ে-জোড়া মূল একটি বট গাছের বহু শাখাপ্রশাখা অনেকদূর পর্যন্ত প্রসাবিত হয়ে এই মনোরম কুঞ্জরচনা করেছে। একবার এখানে ইষ্টকালয়-নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছিলেন এক ধনী ভক্ত। স্বপ্নাদেশে তা নাকি বারিত হয়। দেবতা মুক্ত-স্থানে থাকতেই ভালবাসতেন। অর্ধসমাপ্ত মন্দিরের ভাঙা ইট এখনও স্তূপীকৃত দেখা যায় স্থানে-স্থানে। স্থানটি সত্যই প্রকৃতির শোভা-নিকেতন। দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ ও জলাভূমির মাঝখানে যেন প্রচ্ছায়-স্নিগ্ধ শ্যামলিম-মধুর মরূদ্যান।

আমাদের পাড়ার বৌ ঝি ও প্রবীণারা পরিণাম-রমণীয় গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে দল বেঁধে কলসী কাঁখে ঐ বিলে জল আনতে যেতেন। অনেক সময় ঝিরঝিরে বাতাসে বসে গল্প গুজব করে দূর থেকে ৺বিজয়াচণ্ডীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে জল নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। ধাপের আড়ালে পাঁকের উপরিভাগে কালো শীতল জল। বদ্ধ জলাশয় হলেও সারাদিন রোদের তাপ পেত সেই জল। তাই বিলের জল নির্দোষ ও নির্মল পানীয়রূপে ব্যবহার করতেন বহুগ্রামের লোকেরা। মেটে কলসে রক্ষিত বিলের জল থাকতে সুপরিচ্ছন্ন বৃহৎ দীঘির জল আমরা পান করতাম না। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির প্রাণ জুড়িয়ে যেত সেই শীতল পানীয়ে।

বহু-বিভক্ত শস্যক্ষেত্রের সীমানির্দেশক উঁচু আলির পথ ধরে মায়েরা বিলে জল আনতে যেতেন। কিছুদিন হ'ল বিলে জল আনতে যাওয়া নিষেধ করে দিয়েছেন বাবা। মামলা-মোকদ্দমা চলছে এমন অনেকের সঙ্গে যাঁদের জমিজমা আছে ঐ বড়বিলে। নিজেদের বাড়ীর পুকুরের জলও মন্দ নয়। ফিল্টার করে খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পরিবারে প্রবীণতমা ছিলেন বড়জেঠিমা, আমাদের শৈশবের উচ্চারণ-বিকৃতিতে বও বা বয়। তিনি বাবার জ্ঞাতি-অগ্রজের বালবিধবা। নিজের দেবরের সংসারে বাস করতে না পেরে তিনি

আমার ঠাকুরদা'র আমল থেকে আমাদের বাড়ী এসে বাস করছেন। বার্ধক্যেও পরমাসুন্দরী। রন্ধনে তিনি ছিলেন অন্নপূর্ণা। অমৃতের মতো তার রান্নার প্রতিটি পদ—অথবা মধুর পদাবলী। আশী বছর পর্যন্ত সুস্থ দেহে সুবৃহৎ পরিবারের সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিঃস্বার্থ সেবা করে আকস্মিক অগ্নিদাহে এই নিঃসন্তানা বিধবা প্রাণত্যাগ করেন।

কথিত দিনে গ্রীষ্মের সন্ধ্যার কিছু আগে তিনি দেবরের নিষেধ লঙ্ঘন করে তাঁর অনুপস্থিতিতে ছোট-জা অর্থাৎ আমার মাকে নিয়ে বিলে জল আনতে গেলেন। মা'র তখন দু'একটি সন্তান আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর অবরোধবাসিনীদ্বয়ের অন্তরে মুমুক্ষা জেগেছিল। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে ৺বিজয়াচণ্ডীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে কলস ভরে দুই জা সান্ধ্যসমীরে অস্পষ্ট আলো-আঁধারে আলির পথ ধরে ত্রস্তভাবে এগুচ্ছেন সন্ধ্যাদীপালোকিত বাড়ীর দিকে। সামনে দেখা গেল, হন্‌হনিয়ে আসছেন বিপরীত দিক্ থেকে দু'টি বলিষ্ঠ পুরুষ। একজনের মুখে চাঁপদাড়ি—গৌরবর্ণ। ওমা, এ-যে সেই বড়ো মোল্লা, বাবার মামলার প্রতিপক্ষ প্রতিপত্তিশালী গাঁতিদার। বাবার নিষেধ লঙ্ঘন করে আসার ফল বুঝি সদ্যঃ ফলল। জলাহরণ-রতা দু'জনের মুখ শুকিয়ে গেল। থমকে দাঁড়ালেন তাঁরা।

বড়ো মোল্লা সাহেবের যাওয়া-আসা ছিল আমাদের বাড়ীতে মামলার পূর্বে। মায়েদের তিনি চিনতেন। দারুণ ভয় পেয়ে গেছেন ঠাকরুণরা, পলকে বুঝে নিয়েছেন প্রবীণ। আলির পথ থেকে ক্ষিপ্র নেমে দাঁড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন,—কেমন ভালো মানুষের মেয়ে আমার মা আর জেঠীমা। বুড়ো ছেলেকে দেখে ভয় পেতে হয়? বড়ো মোল্লা মামলা করে, বড়ো মোল্লা মুসলমান। তাই বলে বড়ো মোল্লা মা-জেঠীমাকে চেনে না? আমার কি সাধ, আমাদের গেদে'র একটা মানুষের-মতো-মানুষ ছোটবাবুর সঙ্গে মামলা করি? তা যাক্-গে সে কথা। বরকন্দাজ হয়ে, মা-দের বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি, আর ছোটবাবুর সঙ্গে অনেকদিন পরে একটু দেখাশুনো করে আসি।

আগে আগে বড়ো মোল্লা আর তার বলিষ্ঠ সহচর। পিছনে কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা দু'টি মাতৃমূর্তি। বাবা বাড়ী এসে শুনে ফেলেছেন, গোপনে বিলে জল আনতে গেছেন মায়েরা। উদ্বেগের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছেন তিনি। এর

মধ্যে ওঁদের আগলিয়ে নিয়ে এলেন স্বয়ং মামলার প্রতিপক্ষ বড়ো মোল্লা সাহেব। ছোটবাবু সেলাম,—সেলাম দিয়ে বলে চললেন তিনি।—বয়সে তুমি আমার ছোটো। ডাটেল মানুষ তুমি, একডাকে তোমায় চেনে পরগণার সব লোক। মায়েদের বড়ো বিলের জল আনতে বড়ো কষ্ট হয়। পাঁকে নেমে ধাপ সরিয়ে ছেঁকে জল তুলতে হয়। বিলের ওপর পনেরো-বিশ হাত লম্বা একটা বাঁশের চার বানিয়ে দাও। চারের ওপর বসে দূরের পরিষ্কার জল আনতে পারবেন তোমাদের বামুনপাড়ার মায়েরা।

বাঁশ তো তোমার ঝাড়ে প্রচুর আছে। লোকে চেয়ে-চিন্তে চুরি করেও তো তোমার কত বাঁশ নিয়ে যায়। আর কিষাণ-খরচ, তা তোমার লাগবেনা। আমার তো লোকজন আছে, লোক আমি দেব। কথা রইল তা হ'লে। কা'লই চার বাঁধতে হবে।—সত্যিই পরের দিন বিলের ওপর বিস্তৃত বাঁশের চার বা সাঁকো নির্মিত হয়ে গেল বড়ো মোল্লার তাগিদে ও আনুকূল্যে।

—বুক-ভরা মধু, বঙ্গের বধূ, জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ, করে আন্‌চান্, চোখে আসে জল ভরে।—

রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই প্রাণের মালিক, একা হিন্দু ছিলেন না, মুসলমানও ছিলেন। কোথায় গেলেন বাংলার সেই হিন্দু-মুসলমান ?

এ-কাজি সে-কাজি নয়

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। উনিশ-শো-তেইশ সালে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। সে-বছর স্থগিত রাখতে হ'ল কোনও কারণে। ছাত্রবৎসল আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ডেকে নিলেন একটি কাজের ভার দিয়ে। চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত পূর্ববঙ্গের পুরোনো পালাগান বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মৈমনসিংহ-গীতিকা নাম দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালাগানগুলি সম্পাদন করে প্রকাশ করবার প্রস্তাব নিয়ে ডাঃ সেন স্যার আশুতোষের নিকট উপস্থিত হ'লেন। সারস্বত কর্মীর কল্পতরু, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ আশুতোষ সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। মূল পালাসংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে'র সঙ্গে পূর্ববঙ্গে আরও তিনজন বেতনভোগী পালাসংগ্রহে নিযুক্ত হলেন। চট্টগ্রামে আশুতোষ চৌধুরী, ফরিদপুরে মুন্সী জসিমুদ্দীন ও মৈমনসিংহে বিহারীলাল চৌধুরী (?)। আমি আচার্যদেবের বেতনভোগী সহায়ক নিযুক্ত হলাম। সম্পাদনকার্যে তাঁকে সহায়তা করা আমার কাজ—পালাগুলির পাদটীকা রচনা, উপদেশমতো ইংরেজি তর্জমা করা, ইংরেজি ও বাংলা ভূমিকা-সংকলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় মুদ্রণ-ব্যাপারে প্রুফ-সংশোধন ইত্যাদি ছিল আমার কাজের অঙ্গীভূত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসাবে তখন আচার্য দীনেশচন্দ্রকে একটি দায়িত্বপালন করতে হ'ত। বৎসরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সংক্রান্ত নির্দিষ্ট-সংখ্যক বক্তৃতা দেওয়া সেই দায়িত্ব। সিনেট হাউসের পশ্চিম কক্ষ ছিল এই সমস্ত বক্তৃতার স্থান। তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকত। চন্দ্রকুমার দে'র প্রেরিত একটি পালাগান সেদিনকার বক্তৃতার বিষয় ছিল। পালাটির বিষয় ছিল, এক কাজি-কর্তৃক একটি সুন্দরী পল্লীবালিকার অপহরণ এবং সেই বালিকার চরিত্রবলে শেষপর্যন্ত কাজির পরাজয় ও বালিকার উদ্ধার। প্রবীণ সাহিত্যরথী তাঁর অনন্যসুলভ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে সম্পাদিত পালাগানটির বিশ্লেষণ করলেন। তাঁর স্বাভাবিক পাঠে পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হ'ত। তাতে পাঠ ও আবৃত্তি সমধিক সজীব ও প্রাণপূর্ণ হয়ে উঠত। বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলীও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতেন ও উপভোগ করতেন।

যতদূর মনে পড়ে, সেদিনকার সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক ডাঃ হীরালাল হালদার, অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডাঃ আই. জে. এস্. তারাপুরওয়ালা, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন, অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, অধ্যাপক মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ সারস্বত-বৃন্দ। বাহিরের বিশিষ্ট গণ্যমান্যদের মধ্যে ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি স্বনামখ্যাত সুধী। সভাপতি ছিলেন স্বয়ং স্যার আশুতোষ। আমার সতীর্থ বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন সে বক্তৃতায়। পূর্ববঙ্গগীতিকার অপরাপর বক্তৃতার মতো সেদিনকার বক্তৃতাও সবার হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

বক্তৃতার অবসানে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে আলাপের জন্যে এগিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে কবি-সমালোচক অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন তরুণ এক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করে বললেন, এই যে কাজি-সাহেবও এসেছেন যে! কাজি-সাহেব হলেন সদ্যঃ-কারামুক্ত হাবিলদার কবি কাজি নজরুল ইসলাম। সেই সভায় তাঁর উপস্থিতি এতক্ষণ কারও গোচর হয়নি। তাঁর আকস্মিক আবিষ্কারে সেদিনকার বক্তা স্বয়ং আচার্য দীনেশচন্দ্রের মতো আমরা তাঁর ছাত্রমণ্ডলী এবং সমাগত মান্যগণ্যদের কেউ কেউ একটু বিপন্ন হয়ে পড়লাম এবং সেদিনকার পালাগানের বিষয়বস্তু স্মরণ করে কবি কাজি নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমাদের সেই কুণ্ঠিত-ভাবটুকু সহৃদয় কবির খরদৃষ্টি অতিক্রম করল না। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাসির সঙ্গে অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেনের উক্তির রেশ ধরে ঘোষণা করলেন, "এ-কাজি সে-কাজি নয়।"

সূর্যকিরণের মতো স্বতোদীপ্ত সে-হাসি। বলিষ্ঠ অকৃত্রিম সহৃদয়তা। পলকের মধ্যে সবার অন্তর থেকে অস্বস্তির ভাবটুকু অপসারিত হয়ে গেল। কাজি নজরুল ইসলাম এগিয়ে এসে করপ্রসারণ করে আচার্য দীনেশচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করলেন। এর পরে কয়েকবার আচার্যগৃহে কবির গতাগতি এবং সাহিত্যগুরুর সঙ্গে ভাববিনিময় প্রত্যক্ষ করেছি। আচার্য দীনেশচন্দ্র আজ পরলোকে। কবি নজরুল ইহলোকে থাকলেও তাঁর দেশবাসী আজ তাঁর সঙ্গ-হারা! কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের স্মৃতিটুকুও কি আমরা মুছে ফেলব?

অসময়ের অতিথি

পরবর্তী সাক্ষাৎকারে কবি নজরুলের অন্তরের সামীপ্যলাভ করবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। যতদূর মনে পড়ে, উনিশ-শো-উনত্রিশের শীতকালের প্রথম ভাগ। কিছু-কমবেশি এক বছর হ'ল, চাটগাঁ সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপনার কাজে আমি যোগ দিয়েছি। বাংলা দেশের ছ'টি সরকারি কলেজে প্রথম-সৃষ্ট বাংলার অধ্যাপকের পদে নবনিযুক্ত ছ'জন অধ্যাপকের একজন আমি। চাটগাঁর ছেলেরা বাংলা ভালো করে পড়ত। বাংলাকে তারা ভালবাসত। বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব এর মূলে হয়ত ছিল। সিন্ধুমেখলা কাননকুন্তলা ভূধরস্তনী চট্টলা। আমার প্রথম সরকারি চাকরি কোলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে হ'লনা, একেবারে দেশের পূর্ব-দক্ষিণ প্রত্যন্তসীমায় সুদূর চট্টলে এসে ছিটকে পড়লাম, এ-জন্যে চাকরির প্রথমদিকে মনে কিছু ক্ষোভ ছিল। মনে পড়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কিছুদিন আগে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠিতে অনেক কথার মধ্যে একটি কথা লিখেছিলেন, "তোমার অধ্যাত্মপ্রকৃতি-বিকাশের অনুকূল স্থানে তুমি গিয়েছ। চিত্তের প্রসাদ রক্ষা করে কাজ করে যাও।" চট্টগ্রামের সহৃদয় ছাত্রসমাজের ভাবগ্রাহিতার গুণে আমার অধ্যাপনার কাজটি অত্যল্পকালের মধ্যে হৃদ্য হয়ে উঠেছিল। গুরুবাক্যের সার্থকতাও ধীরে ধীরে উপলব্ধির বিষয় হয়ে উঠতে লাগল। অল্পদিনেই আমার চট্টলপ্রবাসের ক্ষোভ অন্তর্হিত হ'ল। অনুকূল পবন বইল।

তখন সবে সংসারী হয়েছি। চাটগাঁয় বাসা নিয়ে আছি। দেবপাহাড়-সংলগ্ন একটি টিলার ওপর মেটে দেওয়ালে সতেরো টাকা ভাড়ায় বাসা। শুনেছি, মেটে ঘরটি পূর্বে ধনীর গোশালারূপে ব্যবহৃত হ'ত—এখন 'গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ'। আমরা ছিলাম আট-ন'টি প্রাণী—নাতিক্ষুদ্র পরিবার। মেটে ঘরের তিনটি মাত্র প্রকোষ্ঠ। বাইরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দু'তিনখানি হাতল-ছাড়া চেয়ার ও ছোট একখানি টেবিল। সদ্যঃক্রীত দুটি খোলা পুস্তকাধারে বইপত্র। কক্ষটি একই সঙ্গে অধ্যয়নকক্ষ ও বৈঠকখানা। আবার রাত্রিতে চেয়ার টেবিল সরিয়ে কক্ষটিকে শয়নাগারে রূপান্তরিত করতে হয়।

শীতের রাত্রি। দশটার বেশি বেজে গিয়েছে। নৈশ আহার সমাপনান্তে

সকলেই শয্যাগ্রহণ করেছি। এমন সময়ে বাইরে অপেক্ষাকৃত জোরে শিকল-নাড়ার শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকের পদশব্দ এবং অমুচ্চকণ্ঠের কথোপকথন। একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল। পলকের মধ্যেই শয্যা ও শয্যালগ্ন জীবদের স্থানান্তরিত করতে হবে। শয্যাগৃহকে বদলিয়ে. বিশ্রামকক্ষে রূপান্তরিত করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ তখনও আসেনি, সাইরেন-বাঁশির সঙ্গতে দ্রুত অপসারণের কৌশলটি তখনও আয়ত্ত হয়নি। তথাপি মর্যাদারক্ষার দায়ে সকলের ক্ষিপ্র ও পূর্ণ সহযোগিতায় মশারি ও অপরাপর শয্যাদ্রব্য স্থানান্তরিত করে আগন্তুকদের অভ্যর্থনার জন্য কক্ষটিকে সাধ্যমত সজ্জিত করা গেল।

দরজা খুলতেই চোখে পড়ল কুঞ্চিত কেশ ও দীপ্ত নেত্রবিশিষ্ট কবি কাজি নজরুল ইসলামের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি। তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে যুবকেরা, বেশির ভাগ আমারই হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ছাত্রেরা, যাঁদের সকলকে সংবর্ধনা করবার বা বসতে দেবার মতো জায়গাটুকু পর্যন্ত ছিল না সেই ক্ষুদ্র কক্ষে। আমার সমস্যাটি উপলব্ধি করে তীক্ষ্ণধী সহৃদয় কবি উচ্চহাসির সঙ্গে অনর্গল বলে চললেন।—শান্ত নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে দুপুর রাতে ডাকাত পড়েছে। আপনারই পরিচিত এই দলবল নিয়ে এসেছি। অসময়ের অতিথির আতিথেয় সৎকারের জন্যে কিছুই ভাববেন না। অতিথিসৎকার বকেয়া থাকুক এবার। আর একবার এসে সুদে-আসলে উশুল করা যাবে।

অসময়ের অতিথির কথার প্রবাহ বয়ে চলল,—"জানেন তো, আমি বাউল, ভবঘুরে। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারিনে, সফরে বেরিয়েছি। ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখলি ঘুরে এলাম। শেষে চাটগাঁয় এসে পড়া গেল। অন্য শহরগুলি কেমন যেন গরম লাগল। তুলনায় চাটগাঁ বেশ ঠাণ্ডা। এখানে প্রকৃতি স্নিগ্ধ, আত্মীয়ভাবাপন্ন। মানুষও উদার সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। ইসলাম ও হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির ত্রিবেণী-সংগম এই চাটগাঁ শহরে সব সম্প্রদায়ের যুবকদের সঙ্গে মিশে বুঝলাম, বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তারা ভালবাসে। কলেজের পড়ুয়ারা দরদ দিয়ে বাংলা পড়ে এবং তাদের ওস্তাদ আপনাকে তারা ভালবাসে। আপনার হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান অনেক সাকৃরেতের সঙ্গে চেনাশুনা ও ভাববিনিময় হ'ল। ভাবলাম, ওস্তাদজীই বা বাদ যাবেন কেন? তাই বিনা বিজ্ঞপ্তিতে অসময়ে অতিথি হলাম আপনার হৃদয়ের দুয়ারে।

—গৃহে আজ আর প্রবেশ নাই করলাম। একটা কথা বলে যাই, ভাই। যে উগ্র শ্বাসরোধকারী সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া দেশময় বইছে তাকে রুখতে হলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে তার প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে হবে। আপনি নিষ্ঠা দিয়ে তা শুরু করেছেন, দেখে খুশীতে প্রাণ ভরে গেল। আপনি রইলেন বাংলার এই প্রত্যন্তসীমায় আমাদের একজন ঘাটিয়াল—আমাদের ভাবের ভাবুক, একই রসের রসিক। কি বলেন ভাই।"

কথাগুলির ভাষা হয়ত কতকটা আমার। কিন্তু এই মর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকটা আত্মহারা হয়ে সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহুক্ষণ বলে গেলেন দেশানুরাগী সহৃদয় কাজি-সাহেব। কথা শেষ করে আর একবার উচ্চহাসির সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে বিদায় চাইলেন। যন্ত্রচালিতবৎ আর একবার অতিথিসৎকারের কথা তুলেছিলাম। আর একবার চাটগাঁয় এসে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন, এই বলে আমার মনঃক্ষোভ দূর করে সেদিন সদলবলে বিদায় গ্রহণ করলেন কবি।

কবির চাটগাঁ ত্যাগের কিছুদিন পরে শীতের গভীর নিঝুম রাতে দেবপাহাড়ের সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথ ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে একখানি বেবি-অস্টিন গাড়ী হর্ণ বাজিয়ে উপরে উঠত আর নামত, শুনতে পেতাম। আর সেই গাড়ীর আরোহীদের তরুণকণ্ঠে 'নিশিশেষে নিদ্রাভঙ্গে অর্ধচেতনের সঙ্গে' একটি ঐকতান-সঙ্গীত শুনতাম।

"দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

ইহার অত্যল্পকাল পরেই উনিশ-শো-ত্রিশের গ্রীষ্মকালে চাটগাঁর যুবকেরা ইতিহাস-বিশ্রুত 'অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন' বা প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম সংঘটন করে বসল। এই যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, আমার কলেজের ছাত্র ও স্থানীয় স্কুল-সমূহের ধীমান্ বিনয়নম্র পড়ুয়া যাঁদের যোদ্ধ-পরিচয়টি ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে। কবি কাজি নজরুল ইসলামের চাটগাঁয় আবির্ভাবের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্কস্থাপন করা ঠিক আমার উদ্দেশ্য নয়। হতে পারে, দুটি ঘটনা বিচ্ছিন্ন, কার্যকারণশৃংখলায় গ্রথিত নয়। তবে নজরুলের অমিত প্রাণের প্রভাব এই তরুণ কিশোরদের ওপর কাজ করেছিল, একথা আমি বিশ্বাস করি।

কি বিচিত্র একটি মানুষ এই কবি! একদিকে সাধক রামপ্রসাদের সগোত্র,

শ্যামাসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বাঙালী মুসলমান কবি, অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবপন্থী তারুণ্যের প্রেরণার আগ্নেয় উৎস!

বলা বাহুল্য, অতিথিরূপে নজরুল আমার গৃহে আর আসেন নি। বছর পাঁচেক আগে মাণিকতলায় রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে একটি বাড়ীর দ্বিতীয় তলে আর একবার কবিকে দেখতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার পরমাত্মীয় অধুনা লোকান্তরিত শম্ভুচাঁদ রায়। কবির প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সামরিক জীবনে ইনি ছিলেন কবির অগ্রজ-প্রতিম সঙ্গী, অতিপ্রিয় শম্ভুদা। সেদিন কবিপত্নীকে প্রথম ও শেষ দেখলাম, রোগশয্যায় শায়িতা, চলচ্ছক্তিহীনা। পরিচয় পেয়ে স্বামীর পুরাতন সঙ্গীকে ম্লানমুখে আন্তরিকতার সঙ্গে হাত তুলে নমস্কার জানালেন সাধ্বী। কিন্তু পার্শ্বোপবিষ্ট কবি উদাসনেত্রে ছিলের দূরে তাকিয়ে—কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছিলেন। সেই মর্মভেদী দৃশ্যে দুদিনের অতিপ্রিয় সঙ্গী শম্ভুদার চোখ ফেটে জল বেরিয়েছিল। "নজরুল ভাই" শম্ভুদার কম্পিত কণ্ঠের এই ডাকে সাড়া দেননি সেদিন তাঁর নজরুল-ভাইটি। কিসের যেন মর্মান্তিক অভিমান! কি যেন অজ্ঞাত শঙ্কায় কবির চেতনা আচ্ছন্ন। জানিনে, সৃষ্টির কোন্ অতলান্ত রহস্য নিহিত রয়েছে এই নিষ্ঠুর ঘটনার অন্তরালে! কোন্ দুঃখে কার প্রতি এ দুর্জয় অভিমান বাঙালী কবির?

প্রশংসার বোঝা

তখনও ইংরেজ আমল। অবিভক্ত বাংলা লীগ-মন্ত্রিসভার শাসনাধীন। মাননীয় মৌলভী আবুল কাসেম ফজলুল হক্ তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্য মন্ত্রী চট্টগ্রাম-পরিদর্শনে আসবেন। সঙ্গে আসবেন মন্ত্রিসভার আরও দু'তিনজন সদস্য, যতদূর মনে হয়, মাননীয় তামিজুদ্দীন খাঁ-সাহেব তাঁদের একজন। 'শের-এ বাংলা' আসছেন চাটগাঁয়। চারিদিকে উদ্যোগপর্ব চলছে, সাজো-সাজো রব; চট্টগ্রাম বিভাগীয় হেড-কোয়ার্টার্স। ইংরেজ কমিশনার-ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই তটস্থ। কিন্তু শুধু সরকারী মহলে নয়, দেশের জনসাধারণের মধ্যেও এক বিপুল সাড়া জেগেছে। জনানুরাগী মহামান্য অতিথিকে সমুচিত সম্মান ও আন্তরিকতা-পূর্ণ সংবর্ধনা-জ্ঞাপনের আয়োজন করেছেন সরকারী-বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান। হক্-সাহেব তিনচার দিন থাকবেন, চাটগাঁর অভ্যন্তরভাগে কোন কোন স্থানেও সফর করবেন।

একটি সংবর্ধনা-ব্যাপারের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ছাত্রসমাজের অকৃত্রিম স্নেহপ্রীতি লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম আমি। গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের প্রস্তাবে হক-সাহেবের একটি সংবর্ধনাপত্র রচনা করবার ভার দিয়েছিলেন আমাকে প্রবীণেরা। সংবর্ধনার স্থানটি শহরের উত্তরদিকে তিনচার মাইল দূরবর্তী কোনও গ্রামে। দেশবরেণ্য মুখ্যমন্ত্রীর সুদীর্ঘকালব্যাপী দেশসেবা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় ব্যক্ত করে সাধ্যমত মানপত্রটি রচনা করা গিয়েছিল। এই বিশালপ্রাণ জননায়ক জনগণের খুব কাছে ছিলেন, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় People's man, তিনি ছিলেন তাই, এই ভাবের কথাই ছিল মানপত্রের উপাদান। যা হোক, মানপত্রের রচয়িতা বলে বোধ হয় সংবর্ধনা-সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম এবং মঞ্চে রক্ষিত একটি নির্দিষ্ট আসনে বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ও গণ্যমান্যদের পার্শ্বে স্থান নির্ধারিত হয়েছিল ধনমানহীন এই শিক্ষকের। সভার সময় ছিল বিকাল চারটা।

শীতকাল। ক'দিন ধরে শীতের প্রকোপ পড়েছিল বেশি। চাটগাঁয় শীত এমনি একটু বেশি। শহর থেকে তিন মাইল দূরে গ্রামের ও মাঠের পথ ধরে সভাস্থলে যেতে হবে। মোটর চলাচলের একটি প্রশস্ত রাস্তাও ছিল। কিন্তু

আমরা তো পদাতিক, রথী নই। শহর থেকে ব্যয়সাধ্য গাড়ী নিয়ে যাওয়া-আসা তখন আমার অথবা সঙ্গী সোদরোপম অধ্যাপক-বন্ধু মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীনের পক্ষে সুসাধ্য ছিল না। তাই একটু আগে থেকেই প্রায় দু'টোর সময় দুই বন্ধুতে পদযাত্রা করা গেল। শহরের উত্তরে চকবাজার কাতলগঞ্জ প্রবর্তক সংঘের নবনির্মিত আশ্রম প্রভৃতি ছাড়িয়ে গ্রামে পড়া গেল। দু'ধারে মাঠ. ধানের ক্ষেত। বেশির ভাগ ফসল উঠে গিয়েছে—নাড়ার অবশেষ রয়েছে।

কখন কখনও পথ-সংক্ষেপ করার জন্য নলছেয়া পাড়ি দিতে লাগলাম, অর্থাৎ সদ্যঃকর্তিত ধানের ক্ষেত্রে মাঝ দিয়ে কোণাকুণিভাবে চরণ-তরী চালিয়া দিলাম। উৎসবগামী পদস্থ ও সম্পন্নদিগের মোটর গাড়ী হর্ণ বাজিয়ে পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল। সঙ্গী মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীন ভায়া ও আমি বাউল-গীতির প্রসঙ্গ-কথায় মসগুল হয়ে পথের দূরত্ব ও দূরত্ববোধ অতিক্রম করতে লাগলাম। কঠিন প্রয়াস ও বহুপ্রতীক্ষার পর স্থানীয় সরকারী কলেজে বাংলার অধ্যাপকের দ্বিতীয় পদ সৃষ্টি হওয়ায় সেই পদে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীন নিযুক্ত হয়ে সবে এসেছেন। বাউল-অনুরাগী বন্ধুবর তখন 'হারামণি' সংগ্রহে তৎপর ছিলেন। তাই সারাপথ বাউল-প্রসঙ্গ এবং বাংলার অধ্যাপনার মর্মকথা, বাংলার অধ্যাপক-দিগের দুঃখদুর্দশার কথা আলোচনা করতে করতে তিনটার কিছু পরে সভা-প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলাম।

দূর থেকেই লক্ষ্য করা গেল বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত বিপুল জনতা। বহু সহস্র নাগরিক ও পল্লীবাসী। ধনি-নির্ধন, প্রজা-জমিদার, পণ্ডিত-মূর্খ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, শ্রমণ-পাদরী, পণ্ডিত-মৌলবী সকলকে মিলিয়েছিলেন সেদিন ফজলুল হক্ সাহেব। সবার প্রাণে আনন্দ, মুখে উৎসাহের হাসি। কখন সর্বজনবরেণ্য জননায়ক শের-এ-বাংলাকে দেখা যাবে—সবার প্রাণে এই ঔৎসুক্য। অধীর প্রতীক্ষাভরে জনতার মধ্য হ'তে বিপুল হর্ষধ্বনি ও জিন্দাবাদ উঠতে লাগলো। সুবিস্তৃত সভাপ্রাঙ্গণ উপচিয়ে জনতার একাংশ পাশের ধানের ক্ষেতসমূহে স্থানসংগ্রহ করে নিয়েছিল। জনগণের কোন-কোন অংশ সঞ্চরণশীল হ'য়ে এদিক্-ওদিক্ করছিল। তখন দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন, নীল আকাশের তলে সমুদ্রে তরঙ্গবিক্ষোভ উঠছে। চারিটার কিছু আগে সোৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় জনতা কিছু অধীর ও অশান্ত হ'য়ে উঠেছিল। মাঝে-মাঝে সাইকেল-আরোহী পতাকা-ধারী স্বেচ্ছাসেবকের আবির্ভাবে হর্ষধ্বনি উঠছিল, "আ ই য়ে রে আ ই য়ে"।

নির্ধারিত সময় এল। চারটে বেজে গেল, উৎরে গেল। বহু-প্রতীক্ষিত সুচির-প্রত্যাশিত অতিথি তখনও এলেন না। সবার উদ্বেগ, "কি হ'ল? কেন এলেন না?" কিছু-সময় এমনি কেটে যাওয়ার পর খবর পৌঁছাল, আগের দিন হক্‌সাহেব স্টীমলঞ্চে করে কাক্‌সবাজারে গিয়েছিলেন। আসবার পথে মহিষ-খালির ধারে চড়ায় লঞ্চ আটকে যাওয়ায় আসতে কত দেরি হবে, বলা যায় না। নৈরাশ্যের দুঃখ-বেদনায় প্রতীক্ষমাণ বিপুল জননিবহ আর্তনাদ করে উঠল। জনতার মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও কোলাহল দেখা দিল। সংবর্ধনা সভার উদ্যোক্তারা জনতাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করে সভাপ্রাঙ্গণে শান্তি ও শৃংখলা-স্থাপনের বহুভাবে প্রয়াস পেতে লাগলেন।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন শহর ও গ্রাম অঞ্চলের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, মহকুমা হাকিমেরা, সিভিল সার্জন, সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, উকিল-সরকার, লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। অনেকেই প্রয়াস পেলেন, কিছু বলে অধীর জনতাকে শান্ত করবার জন্য। ব্যর্থ হ'ল সে প্রয়াস—অবুঝ জনতার বহুলাংশ গ্রামদেশাগত। অকৃত্রিম অনুরাগে ঐকান্তিক আগ্রহে তারা অদম্য। নির্ধারিত সময়ের পরে আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। পাঁচটা বাজল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শীতের আঁধার নেমে এল।

এই সময়ে দেখা গেল আলোকিত সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন এক বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় মুসলমান যুবক। যতদূর মনে পড়ে যুবক অন্ধ। সভা-সমিতিতে অনেক সময়ে তাঁকে দেখা যেত। উচ্চশিক্ষিত নন সে যুবক। তথাপি সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংক্রান্ত সভাসমিতিতে শহরে ও সুদূর গ্রাম-অঞ্চলে তিনি যেতেন। কণ্ঠটি ছিল তাঁর মধুর। যাওয়া-আসার পথে অনেক সময় তাঁর গান শুনে অবসর ও শ্রান্তিবিনোদন করা যেত। তাঁর শারীরিক শক্তিমত্তার জন্যে ভালবেসে লোকে তাঁর নামের সঙ্গে একটা আপত্তিকর বিশেষণ যোগ করতেন। যুবকের নাম ও বিশেষণটি না-ই বা বললাম! যুবক যেন কিছু বলবার জন্যে এগিয়ে আসছেন। অনেকে তাঁকে রুখতে চাইলেন, কিন্তু নেতৃস্থানীয় প্রবীণেরা তাঁকে কাছে আনিয়ে মঞ্চের উপর পুরোভাগে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জনতাকে শান্ত করবার জন্যে যুবক ছোট-খাটো একটি বক্তৃতা দিলেন, খাস্ চাটগাঁর চল্‌তি-ভাষায়—যে-ভাষা বর্মী-ভাষাও নয়, গ্রীক-লাটিনও নয়, বাংলা ভাষারই একটি কথিত সুললিত

রূপভেদ। কান ও মন পেতে শুনলে সে-ভাষা সুন্দর, সুবোধ ও সুশ্রব বলেই মনে হয়।

তিনি যা বললেন তাঁর মর্মটি এমন হবে। "ভাই সকলেরা তোমরা হামলা করছ কেন? এত সোর তুলছ কেন? বড়মিঞা সাহেব আসবেন বলে? দেশের মানুষ তাঁকে ভালবাসেন। তিনিও সকলকে ভালবাসেন। তিনি যখনই আসুন, আসলে পরে তাঁকে দেখবেন আপনারা। আর না-ই যদি বা আসতে পারেন, না-ই বা দেখলেন এবার তাঁকে। মনে-মনে তাঁর ভালবাসার কথা ভেবে যে যার কাম-কাজ ঠিকমতো ইমান মতো করে গেলে তাঁকে ভালবাসা হবে।

"তাঁর কথা শুনবার বড় হাউস ছিল আপনাদের কেমন? এ-সভায় অনেক মানুষ এসেছেন যাঁরা খুব ভালো ভালো কথা বলতে জানেন - যা শুনলে আপনাদের মনপ্রাণ ভালো হবে, দিলে জোর আসবে।"—এই বলে সেই সভায় সমাগত বিশিষ্টদের নামের একটি তালিকা দিলেন সেই যুবক যা তিনি অন্ধ হলেও সংগ্রহ করছিলেন এইটুকু সময়ের মধ্যে সবার কাছে শুনে নিয়ে। চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান চারি সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সবার নাম ও তাঁর জ্ঞানবিশ্বাসমতো তাঁদের সকলের যথার্থ পরিচয় যুবক দিয়ে যেতে লাগলেন। নামটি আগে বলে পরে পদ-পরিচয় যোগ করে দেওয়া চাটগাঁর ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য—যেমন যতীন-ব্যারিষ্টর, আজিম-ব্যারিষ্টর, রতন-মোক্তার। তাঁর-দেওয়া এই নামের তালিকায় স্থানীয় প্রধানেরা একে একে প্রায় সবাই উল্লিখিত হলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই ঘোষণার সঙ্গে এইভাবে যুক্ত হ'ল একজন অতি সাধারণ অ-প্রধান ব্যক্তিরও নাম, "এই জমায়েতে হাজির আছেন, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের জনার্দন-পরফেসার— যিনি হিন্দু-মুসলমান ছালিয়াদের একচোখে দেখেন।"

এই যুবক স্কুলকলেজের ত্রিসীমানা মাড়াননি কোনদিন। এই হিন্দু-'পরফেসার'-সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণার মূলে হয়ত ছিল স্থানীয় কলেজের প্রীতিমান্ ছাত্রদলের মতামতের প্রভাব। বলা বাহুল্য, পরিচয়টি যাঁর সম্বন্ধে ব্যক্ত হ'ল তিনি শিউরে উঠেছিলেন সেই অশ্রুতপূর্ব প্রশংসাবাক্য শুনে। প্রশংসার এই বোঝা বইবার যোগ্যতা বা সামর্থ্য তাঁর নেই। বুকে হাত দিয়ে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই প্রশংসার যোগ্য হবার জন্যে তিনি কি করেছেন

জীবনে। আত্মসমীক্ষা-মূলক এই প্রশ্নের সদুত্তর অন্তর থেকে মেলেনি সেদিন। কিন্তু এই ভেবেই তাঁর আনন্দ, হিন্দু-মুসলমানকে একচোখে দেখা যায় এমন একটি জীবনাদর্শে বাংলার মুসলমান-গরিষ্ঠ অঞ্চলের অধিবাসী একটি শিক্ষালোক-বঞ্চিত অন্ধ মুসলমান যুবক বিশ্বাস করেছিলেন। সেই অন্ধ মুসলমান যুবক আজ কোথায় কি ভাবে আছেন, জানা নেই। তবে যাঁকে পরিচায়িত করতে চেয়েছিলেন তিনি নিজগুণে তাঁর নিজস্ব প্রাণের ভাষায়, তাঁর আজও বেঁচে থাকবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণাটি তিনি কি জানি কেমন করে ধরতে পেরেছিলেন। পাঁচশো বছর আগে যুগ-মানবের আগমনী সূচিত করে বাংলার আদি গীতিকবি গেয়েছিলেন,

> "শোনরে মানুষ ভাই
> সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

গুরু-শিষ্য

গুরু-শিষ্য

পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্

সেনহাটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। স্কুলবাড়িতে উত্তরে পশ্চিমে পাকা এমারত। পূবে লম্বা খড়ের ঘর। বায়ু ও ঈশান দুই কোণে ছোট ছোট টিনের ঘর। সামনে-পূবে প্রশস্ত খেলার মাঠ। দক্ষিণে বড়ো রাস্তা, তার সমান্তরালভাবে প্রবাহিত ভৈরব নদের একটি বড়ো বাঁক। নদীর কলতান ঝাউগাছের শন্‌শন্ শব্দের সঙ্গে মিলে কিশোর বিদ্যার্থীদের প্রাণে এক রহস্যগভীর আনন্দ-বেদনা-বিধুর অনুভবের সৃষ্টি করে। নদীর অপর পারে, অদূরে কিছু-পশ্চিমে, দৌলতপুর কলেজ—হিন্দু একাডেমি ও তৎসংলগ্ন ৺দধিবামনদেবের মন্দির, প্রাতঃস্মরণীয় প্রখ্যাতনামা মনীষী ব্যবহারাজীব ব্রজলাল শাস্ত্রীর বিশাল কীর্তি। পাঁচ মাইল দূরে খুলনা শহর। রেল-স্টিমারে যাতায়াতের সুবিধায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, পূজাপার্বণে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে, গৌরবময় ঐতিহ্যে-গাঁথা তৃপ্ত নিশ্চিন্ত শ্রীময় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি—সেনহাটি-চন্দনীমহল, খালিসপুর-মহেশ্বরপাশা, দেয়ানা-পাবলা-দৌলতপুর। দৌলতপুর কলেজের ছাত্রেরা যশোহর-খুলনার ঐতিহাসিক অক্লিষ্টকর্মা খ্যাতিমান্ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের ইতিহাস থেকে গ্রামের নাম সংগ্রহ করে ছাড়া বেঁধে ভাটিয়ালি সুরে গাইত শারদীয় সম্মেলনে। "বন্দেমাতরম্"-মন্ত্রের এই অভিনব পল্লীভাষ্য উন্মাদনাময় দেশপ্রাণতার সৃষ্টি করত সহস্র সহস্র তরুণ হৃদয়ে উচ্চশিক্ষার এই গ্রামীণ কেন্দ্রে।

বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকে সেনহাটি হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠার বছরই এই প্রতিষ্ঠান খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে। গ্রামেরই ছেলে মেধাবী ছাত্র কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। প্রতি বছর পুরস্কারবিতরণী সভায় ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে গর্বের সঙ্গে সে-কথার আবৃত্তি করা হ'ত। স্কুলে পঠদ্দশায় (১৯১০-১৯১৭ ইং) আমরা দু'জন হেডপণ্ডিতকে পেয়েছিলাম। প্রথমজন ছিলেন বরিশাল পূর্বমানপাশা-নিবাসী ৺যদুনাথ কাব্যতীর্থ। সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ জীবনে পাথেয় করে নিতে পেরেছিলাম তাঁরই পাদমূলে বসে, তাঁরই দেওয়া সুশিক্ষার গুণে! গৌরকান্তি গম্ভীরপ্রকৃতিক স্বল্পভাষী ব্যক্তি

ছিলেন আমাদের পরম পূজনীয় পণ্ডিতমশাই। বরিশালী পণ্ডিত—বরিশালের উচ্চারণ-ভঙ্গিমা প্রকটিত হ'ত তাঁর কথায়, পাঠনে। অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তাঁর প্রতি আমাদের। কোমলে-কঠোরে, 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' লোকোত্তর-চেতোবৃত্তি আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ মানুষ। শুধু সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগসঞ্চারের জন্যে আমরা যে তাঁর কাছে ঋণী, তা নয়। সুনীতি সুমিতি শ্রদ্ধাভক্তি সৌজন্য সদাচার স্বধর্মনিষ্ঠা চিরদিনের মতো মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন ছাত্রদের অন্তরে দেবভাষার এই প্রথমতম শিক্ষক আমাদের।

আমাদের পরম দুর্ভাগ্য ও শোকব্যথার সঞ্চার করে কঠিন আমাশয় রোগে অকস্মাৎ দেহরক্ষা করলেন আমাদের পরমশুভানুধ্যায়ী পণ্ডিতমশাই। আমরা তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর (প্রাক্-প্রবেশিকা অর্থাৎ এখনকার নবম শ্রেণীর) ছাত্র। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন শশী পণ্ডিতমশাই, অদূরবর্তী সিদ্ধি-পাশা-পল্লীর শশিভূষণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ। আমার পরম-পূজনীয় আত্মীয়-প্রবর স্বনামখ্যাত 'গৌড়ের ইতিহাস'-প্রণেতা মালদহ-প্রবাসী রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের ইনি ছিলেন অনুজকল্প হাতে-গড়া সহকর্মী। আমাদের প্রাক্তন পণ্ডিতমশাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্য এবং তাঁর সদ্যোবিয়োগ-বেদনা নবাগত পণ্ডিতমশাইয়ের প্রতি আমাদের মনকে অযথা অন্যায় এবং অসঙ্গতভাবে কতকটা বিরূপ করে তুলেছিল। সে-কথা মনে করলে আজ মন অপরাধ-ভারাক্রান্ত ও অনুতপ্ত হয়ে ওঠে।

শশী পণ্ডিতমশাই সংস্কৃতের শিক্ষকতা করলেও তাঁর একটি সরস বহুমুখী সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ছিল। বাংলা সাহিত্যেও তাঁর বেশ পড়াশুনা ছিল। গল্পচ্ছলে তিনি বলেছেন, বিপত্নীক রজনী পণ্ডিতমশাই স্বপাকে রন্ধনকালে একহাতে উনুনের জ্বাল সরাতেন আর একহাতে দুরূহ বেদান্তশাস্ত্রের 'পঞ্চদশী' গ্রন্থ নিয়ে তাঁদের মতো প্রবীণ পাঠার্থীকে পাঠ দিতেন। আমাদের স্কুলে যোগ দিয়ে প্রথম দিনেই আমাদের ক্লাসে নতুন পণ্ডিতমশাই হিতোপদেশের 'পক্ষি-বানর-কথা' পড়াতে আরম্ভ করেন। প্রবল বর্ষার দিনে গাছে পাখীরা ঠোঁটে-করে-আনা খড়কুটো দিয়ে তৈরি বাসায় বসে বৃষ্টিবাদলের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছে। আর সেই গাছের তলায় বসে বড়ো-বড়ো হাত-পা ও বড়ো-বড়ো লেজ নিয়ে বানরেরা বৃষ্টিতে ভিজে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। বেচারা পাখীরা তাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে ভালো মনে উপদেশ দিল বাসা বাঁধবার

জন্যে। উপদেশ মূর্খের প্রকোপের কারণ হয়, তাতে তার শান্তি আসে না। দুধ খেয়ে সাপের কেবল বিষই বাড়ে। এই মূল্যবান্ উপদেশটি সংস্কৃত কথাকার গল্পের মাধ্যমে উদাহৃত করেছেন।

গল্পের একজায়গায় আছে "ধারাসারৈর্মহতী বৃষ্টির্বভূব।" পণ্ডিতমশাই তাঁর সুন্দর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সমাপন করে ব্যাকরণ-প্রসঙ্গে এলেন। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" আমার মুনিকল্প আচার্যদেবেরও দ্রুত পাঠনজনিত অনবধানবশতঃ একটি পদপরিচয় ব্যাকরণসম্মত হ'ল না। 'ধারাসারৈঃ' অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া এবং 'বৃষ্টিঃ' উক্তে কর্মণি প্রথমা এই বলে তিনি অন্বয় করলেন। 'বভূব' ক্রিয়াপদটির প্রতি তখন তাঁর লক্ষ্য ছিলনা। তখনই প্রতিবাদের ভঙ্গিতে অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য প্রকটন করে এই অর্বাচীন ছাত্রাধম ঘোষণা করল, 'বভূব' ক্রিয়াপদটি পরস্মৈপদী, সুতরাং বাক্যটি কর্মবাচ্যে নয় এবং অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া এবং উক্তে কর্মণি প্রথমা, এই পদপরিচয় টেকে না। সত্যসন্ধ নিরভিমান পণ্ডিতমশাই তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে ভুলটি মেনে নিয়ে বললেন—ঠিক বলেছিস্, বাবা। আমারই ভুল হয়েছিল। পরে 'বৃষ্টিঃ' পদটি কর্তরি প্রথমা এবং 'ধারাসারৈঃ' সহার্থে অথবা উপলক্ষণে তৃতীয়া বলে ব্যাখ্যা করলেন। গুরুজনের ভুল ধরবার দেমাকে সেদিন এই অর্বাচীন মসগুল হয়েছিল।

আমার জ্যেঠতুতো ভাই মেঘনাথ-দা একদিন খালিসপুর থেকে সেনহাটি আসবার খেয়া পার হচ্ছেন। খেয়াভরা লোক, তার মধ্যে আছেন শ্রদ্ধেয় শশী পণ্ডিতমশাই। খেয়ায় বেশির ভাগ লোক ছিলেন সেনহাটি বাজারের বেনে দোকানী ও মুসলমান দুগ্ধবিক্রেতা। লেখাপড়ার রাজ্য হতে তাঁরা প্রায় নির্বাসিত। সদালাপী লোকবৎসল পণ্ডিতমশাই তাঁদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। আমার বড়দার সঙ্গেও আলাপ হ'ল। বাবার পরিচয়ে পণ্ডিতমশাই বড়দাকে খুব আদর জানালেন। আমার পিতৃদেব পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। বড়দা সাহস করে আমার পড়াশুনার অগ্রগতির কথা জিগ্গেস করলেন পণ্ডিতমশাইকে। আমার পিতৃপরিচয় পেয়ে খুশী হয়ে পণ্ডিতমশাই এক-খেয়া আরোহীদের কাছে আমার কথায় শতমুখ হয়ে উঠলেন। পণ্ডিতমশাই বললেন—ছাত্র অনেক পড়িয়েছি। কিন্তু সত্যকার মনোযোগী তৎপর ছাত্র আমরা বেশি পাইনে।

তোমরা জান, আমাদের শাস্ত্র বলেন, সবার কাছে মানুষ জিততে চায়,

কিন্তু পুত্র ও ছাত্রের কাছে চায় হার মানতে। আমাদের সবচেয়ে বড়ো উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই, ছাত্রের কাছে বিদ্যায় ও মনুষ্যত্বে হার মেনে হাসিমুখে আমরা বিদায় নেব। খাসা ছেলে, মেঘনাথ, তোমার ভাইটি। প্রথম দিনই আমার ভুল-পড়ানো ক্লাসের মধ্যে সেদিন অতটুকু ছেলে শুধ্‌রে দিল। এই বলে ভুলের বিবরণটি তিনি তাঁদের কাছে ব্যক্ত করলেন। ছাত্রবাৎসল্যে আত্মহারা আমার দেবচরিত্র আচার্যদেব এ কথা ভুলে গিয়েছিলেন যে যাঁদের কাছে তিনি এই প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করলেন তাঁরা এর মর্ম সবটুকু গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে তাঁর চরিত্রের মহিমা সেদিন নিশ্চয়ই সকলের অন্তর স্পর্শ করেছিল।

সর্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্—আজ মনে হয়, এই গভীর শাস্ত্র-বাক্য শুধু অক্ষরার্থের বিন্যাস করে বুঝিয়ে যান নি আমাদের পণ্ডিতমশাই, আচরণ দিয়ে জীবনে ঝঙ্কৃত করে তুলেছিলেন সেই মহাপ্রাণ আচার্য।

আমার গুরু ছিলেন সত্যই মুনিবৃত্ত, "বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।" কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। তাঁর ছোট্ট সাময়িক ভুলটুকু তাই। গুরুর দোষ আবৃত করাই ছত্র, তাই যার আছে সে ছাত্র। ছাত্রের এই সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করলে তাঁর এই ছাত্রাধম তো ছাত্র-পর্যায়ের বাইরে পড়ে যায়। গুরুমহিমার স্মরণে অনুতাপের অশ্রু-তর্পণে আজ সেই দেবকল্প শিক্ষাগুরুর উদ্দেশে প্রণতি নিবেদন করি।

একমপ্যক্ষরম্

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দ্বিতীয় দশকেও গ্রাজুয়েট শিক্ষকের সংখ্যা দেশের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে খুব বেশি ছিল না। মুষ্টিমেয় গ্রাজুয়েটেরা তখন ডেপুটি ম্যাজিস্টেট বা অনুরূপ উচ্চ সরকারি পদ লাভ করবার সুযোগ পেতেন। দু'চারজন ত্যাগবুদ্ধি ও আদর্শানুরাগ নিয়ে শিক্ষকতা অর্থাৎ চিরদারিদ্র্য বরণ করতেন। বি. এ.-পাশ শিক্ষক দুর্লভ ছিলেন বলেই বি. এ.-ফেল শিক্ষকের মূল্য ও মর্যাদা তখন নিতান্ত কম ছিল না। আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ জ্ঞানী তীক্ষ্ণধী শিক্ষক বি. এ.-ফেল ছিলেন। কোনও একটি

বিষয়ে হয়ত তাঁদের অধিকার অপেক্ষাকৃত স্বল্প ছিল। তাই দুস্তর বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁদের হয়ে ওঠে নি। কিন্তু অপরাপর বিষয়ে তাঁদের গভীর জ্ঞান এবং শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁদের নিষ্ঠা পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের খ্যাতি অত্যল্পকালের মধ্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ত। আমাদের গ্রামের হাই স্কুলে আমাদের সময় তিনজন বি. এ. ফেল শিক্ষক ছিলেন, যাঁদের সমকক্ষ ঐ-স্তরের শিক্ষক এখন দেখা যায় না। তাঁদের গুণপনা বর্ণনা করতে গিয়ে সকলে এফ্.এ. পাশ বলে তৃপ্ত হতেন না, বি. এ. ফেল পরিচয়ে শ্রদ্ধাভরে তাঁদের পরিচায়িত করতেন। সত্যিই তো, পাশ-ফেলের চেয়ে বড়ো কথা, বি. এ. পরীক্ষার পাঠক্রম আয়ত্ত করে জ্ঞানার্জন করা এবং পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়। এ যেন সারস্বত ক্ষেত্রের নিষ্কাম কর্ম—লাভালাভ, জয়াজয়, পাশ-ফেল এখানে বড়ো কথা নয়। "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী কালে শিক্ষকজীবনে প্রৌঢ় বয়সে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে অধ্যবসায়সহকারে নতুন করে ছাত্রদের দলে মিশে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে যেতেন। আমাদের পঠদ্দশায় বি.এ. ফেল আখ্যায় আখ্যাত, অথচ পরবর্তীকালে সুখ্যাতির সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এমন একজন শিক্ষক ছিলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রাতঃস্মরণীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ইংরেজি তিনি ভালো জানতেন, ভালো পড়াতেন। শুধু তাই নয়, ভালো ইংরেজি শিখবার, নির্ভুল ভালো ইংরেজি লিখবার একটা প্রেরণা তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন। ব্যক্তিত্বে অসম্ভব রাশভারি, তিনি ছিলেন নীতিবাদী স্বল্পভাষী, অথচ সহৃদয় ও সুরসিক ব্যক্তি। দুর্নীতি-পরায়ণ ছাত্রেরা তাঁকে দেখে হাড়ে কাঁপত। তাদের গতিবিধি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি এড়াত না। অথচ সুশীল মেধাবী ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহ অন্তঃসলিল ফল্গুপ্রবাহের মতো বয়ে চলত। সাহস করে বছরে দু'একদিন যারা বাৎসরিক পরীক্ষার নম্বর জানতে তাঁর বাড়ী গিয়ে খারাপ নম্বর পেত তারা যেমন প্রচণ্ড ধমক খেয়ে আসত, তেমন যাঁরা ভালো নম্বর পেত তারা প্রচুর আদর ও উৎসাহ পেত। তাঁর মায়ের হাতের কুল-বরোই-মাখা, কচি-আম-মাখা যখন মাস্টারমশাই আমাদের খেতে দিতেন তখন আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যেতাম, কি ক'রে এই স্বল্পভাষী সাহেবি মেজাজের ইংরেজির সুশিক্ষক এমন খাটি বাঙালীর মতো বাংলার গ্রামীণ আপ্যায়নে আমাদের আপ্যায়িত করতেন

একবার দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলার প্রশ্নপত্র অপ্রত্যাশিতভাবে এই ইংরেজির শিক্ষককে করতে দেওয়া হয়েছিল। অত্যন্ত অভিনব প্রশ্নপত্র রচনা করে তিনি ছাত্রদের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিলেন। পরীক্ষাকার্যেও তিনি স্বতন্ত্র মূল্যবোধের পরিচয় দিতেন। সব-চেয়ে বিস্মিত হলাম আমরা একদিন যে-দিন তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে (এখনকার অষ্টম শ্রেণী) ইংরেজি পড়াতে এসে হাতে করে নিয়ে এসেছিলেন সদ্যঃ-প্রবর্তিত 'মালঞ্চ'-পত্রিকার একটি সংখ্যা যাতে তাঁরই লেখা একটি বাংলা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি খুব করুণ, নামটি মনে নেই। তবে গল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ছবির কথা আজও মনে আছে. "সুকু, কন্যার বিয়ে দিয়ে এলাম।" বিবাহযোগ্য কন্যার সদ্যোবিয়োগ-বিধুর পণপ্রথাক্লিষ্ট দরিদ্র পিতার মর্মান্তিক উক্তি স্ত্রী-সুকুমারীর প্রতি। একনিষ্ঠ দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, স্বল্পে সন্তুষ্টি, চরিত্রবত্তা, সহৃদয়তা, আত্মমর্যাদা, দারিদ্র্যের মধ্যে উচ্চ চিন্তা, দেশাত্মবোধ এই সমস্ত গুণ তিনি অনুভব দিয়ে ফোটাতেন তাঁর গল্পের কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে। মুক্তার মতো সুন্দর গল্পগুলির আড়ালে আমরা প্রত্যক্ষ করতাম তাঁরই মহনীয় চরিত্র, তাঁর আত্মবোধ। 'মালঞ্চে'র জন্যই মুখ্যতঃ তিনি লিখতেন। অনেক সময়ে আমাদের পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তিনি চুপ করে বসে ভাবতেন, অথবা অর্ধসমাপ্ত গল্পের কিয়দংশ দ্রুত লিখে যেতেন। পাঠন-বিরতির মুহূর্তগুলিও আমাদের ব্যর্থ হ'ত না। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে নীরব শৃঙ্খলাবোধে ভরে উঠত।

আমাদেরই ইংরেজির মাস্টারমশায়ের লেখা বাংলা গল্প। আমাদেরই গ্রামের মাসিক-সম্পাদক, প্রবীণ খ্যাতনামা সাহিত্যরথী ও শিক্ষাবিৎ, 'নেশনাল কাউন্‌সিল অব্‌ এডুকেশন্‌'-এর স্বনামখ্যাত শিক্ষণকর্মী কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। এই নিয়ে আমাদের গর্বের অবধি ছিল না। যতীনবাবুব ছোটগল্পগুলি পরে 'দূর্বাদল' 'বিল্বদল' প্রভৃতি নাম দিয়ে সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ছোট গল্প বিবর্তনের ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দান বিস্মর্তব্য নয়। অধুনা-বিলুপ্ত অথবা বিলীয়মান সামাজিক গুণাবলীর স্বচ্ছ আলেখ্য ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরতেন। জার্মাণ ভাষায় অপরাপর বাংলা ছোট গল্পের সঙ্গে তাঁর ক'টি ছোট গল্প অনূদিত হয়েছিল বলে শুনেছি।

যতীনবাবু তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি পড়াতেন। উচ্চতম দুই শ্রেণীতে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি পড়াতেন স্বয়ং প্রধান শিক্ষক পুণ্যশ্লোক ত্রিপুরাচরণ সেন মহাশয় নিজে। আমাদের ইংরেজি শিক্ষার ভিৎ যতীনবাবুই

গড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও সমাদরলাভের দুর্লভ সৌভাগ্য আমি অর্জন করেছিলাম। তিনি একরকম জিদ করে নবম শ্রেণীতে অন্যতর ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণিতের বদলে আমাকে ইতিহাস নিতে বাধ্য করেছিলেন, অনেকটা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমাদের স্কুলে বিগত সাত-আট বছর সরকারি বৃত্তি কেউ পায়নি—ইতিহাসের চেয়ে গণিতে নম্বর ওঠে ঢের বেশি, আমাকে বৃত্তি পেতেই হবে—এই সমস্ত ছিল হেডমাস্টার মশাইয়ের যুক্তি। যতীনবাবুর যুক্তি ছিল এই, আমি নাকি ইংরেজিতে ইতিহাসের উত্তর লিখে গণিতের মতোই নম্বর পাব, ইংরেজিতে ইতিহাস পড়লে আমি আরও ভালো ইংরেজী লিখতে শিখব। অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন যতীনবাবু নিজে। আমাকে তিনি একশো'র মধ্যে চুরানব্বই নম্বর দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা। ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন হেডমাস্টার মশাই স্বয়ং। কিন্তু প্রথম পত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক যতীনবাবু। বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদে সত্তর নম্বর, আর দু'টি ইংরেজি প্রবন্ধরচনায় ত্রিশ। যতীনবাবুর প্রশ্নপত্রে সব সময়েই কিছু নূতনত্ব থাকত। এবার তিনি দু'টি প্রবন্ধের বদলে একটিমাত্র প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছেন, তাতেই ত্রিশ নম্বর। প্রবন্ধের বিষয়টিও সহজ, মুখস্থ করে উদ্গিরণ করা চলে না। নিজের ভাষায় লিখে স্বকীয় চিন্তা ও ইংরেজিভাষায় প্রকাশসামর্থ্যের পরিচয় দিয়ে নম্বর আদায় করতে হবে। প্রাতরুত্থান বা EARLY RISING এই বিষয়টি নিয়ে আমি ত্রিশনম্বরের উপযোগী প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ত্রিশের মধ্যে আমাকে ছাব্বিশ নম্বর দিয়েছিলেন মাস্টারমশাই। বিষয়টি আমার চিরকালীন অভ্যাস ও অন্তর্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। অন্তর্যামী গুরু যেন আমাকে দিয়ে একটি হৃদ্য অনুভব ব্যক্ত করালেন ভাবজীবনের উষামুহূর্তে। আমার লিখিত প্রবন্ধে মাত্র একটা বানান ভুল ছিল। ইংরেজি, 'Whom' শব্দটি আমি বরাবর ভুল বানান লিখে আসছি। অভ্যাসগত সেই ভুলটি অনেকদিন থেকেই আমার 'দ্বিতীয় প্রকৃতির' মতো (HABIT IS THE SECOND NATURE) দুস্ত্যজ হয়ে উঠেছিল। প্রমাদটি স্নেহশীল পরীক্ষকেরও খরদৃষ্টি ও উদ্বেগের বিষয় হয়েছিল কিছুদিন যাবৎ।

পরীক্ষার মাসাধিককাল পরে একদিন দল বেঁধে একসঙ্গে আমরা পনেরো

বিশজন পড়ুয়া স্কুলে চলেছি। প্রায় একটি শোভযাত্রা। সবার পিছনে আমি। একটি সঙ্কীর্ণ পল্লীপথ অতিক্রম করে 'বড়ো রাস্তায়' পড়েছি। বাঁ-দিকের আর একটি সরু পথ ধরে যতীনবাবু এসে চুপি চুপি আমাদের পশ্চাতে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছেন। তাঁকে দেখিনি আমরা কেউ—কলকোলাহলে পল্লীপথ মুখরিত করে আমরা চলেছিলাম। অকস্মাৎ দুই কাঁধে দু'খানি হাতের স্পর্শ এবং প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করে পিছন ফিরলাম। কি সর্বনাশ! স্বয়ং পূজনীয় মাস্টার মশাই যতীনবাবু! সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রচণ্ড ধমকের সঙ্গে প্রশ্ন হল "WHOM" বানান কর্‌তো।" ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আধা ভয়ে আধা কৃতজ্ঞতায় আমি জবাব দিলাম, 'WHOM'-এর শেষে আর কোনদিন "E" যোগ করব না। বিগত বাৎসরিক পরীক্ষায় ইংরেজি প্রশ্নপত্রে একশো'র মধ্যে আটাত্তর নম্বর এবং রচনায় ত্রিশের মধ্যে ছাব্বিশ পেয়েও আমি এই একটিমাত্র মারাত্মক বানান ভুল করেছিলাম। একটিমাত্র অক্ষরের বানান ভুলের সেই ভূত আজ ঝেড়ে তাড়িয়ে দিলেন ওঝা, আমার পরম শুভানুধ্যায়ী উপাধ্যায়।

একটিমাত্র অক্ষরের প্রমাদ। কিন্তু শুধু তাই কি? অগণিত ছাত্র বছর বছর আসে যায়। তাদের মধ্যে একজন পরকীয় ভাষায় একটি বানান ভুল করেছে, আচার্যদেবের তাতেই কত দুশ্চিন্তা! কিভাবে সেই অভ্যাসে পরিণত বদ্ধমূল প্রমাদ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে অ-প্রমত্ত করে তুলবেন! ভুলটির উৎসাদন করবার জন্য যে বিচিত্র ও মৌলিক পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তার মূলে কত স্নেহ, কত শুভানুধ্যান, কত বড়ো দায়িত্ববোধ। ভাবলে চোখে জল আসে। শাস্ত্রের কথা মনে পড়ে,

"একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণীভবেৎ।"

দারিদ্র্যব্রত শিক্ষক ছিলেন আমার আচার্যদেব। দারিদ্র্যে ছিল গর্ববোধ—দীনতা নয়। তার সঙ্গে ছিল অকৃত্রিম ছাত্রহিতৈষণা, অস্খলিত কর্তব্যনিষ্ঠা, অতন্দ্রিত কল্যাণবুদ্ধি। আমরাও শিক্ষক—মানুষগড়া কারখানায় মজুরি করে চলেছি। জীবন-সায়াহ্নে এসে বুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় গেলেন আমাদের দেশের সেই ত্যাগী নমস্য শিক্ষকেরা? আমরা কি তাঁদেরই উত্তরাধিকারী?

মূর্ত মহিমা

ইংরেজি স্কুলে ঢুকবার আগে নাম শুনেছি, দূর থেকে দেখেছি—হেডমাস্টার নেপালবাবু। গৌরবর্ণ নন তবুও অনিন্দ্যকান্তি, অতি সুপুরুষ। রাস্তা দিয়ে চলেছেন, যেন সচল মূর্ত মহিমা, 'অবনী বহিয়া যায়'। গ্রামেরই অধিবাসী, কিন্তু কর্মজীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর বাইরে। শুনেছি বরিশাল-পিরোজপুরে সুনাম ও প্রতাপের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছেন তিনি প্রথম যৌবনে। খ্যাতনামা ইংরেজির অধ্যাপক সগ্যো-লোকান্তরিত মুকুন্দকিশোর চক্রবর্তীর সঙ্গে কিছুদিন আগে আমার কোলকাতায় প্রথম পরিচয় হয়। কথাপ্রসঙ্গে তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে ইংরেজির সুশিক্ষক এবং তাঁরও শিক্ষক হিসা ব এঁর নাম করেছিলেন। নেপালবাবুর সম্পর্কে, প্রবীণ চক্রবর্তী মশাই আমাকে গুরুভাই ডেকেছিলেন। বরিশাল থেকে সেনহাটি স্কুলে নেপালবাবু চলে এসেছিলেন গ্রামকে ভালবেসে, ত্যাগবুদ্ধি নিয়ে, সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে। বিদেশী প্রধান শিক্ষক রাজকুমারবাবু বিদায় নিলে উনিশ-শো-আট কি নয় থেকে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। আমরা উনিশ-শো-দশে স্কুলে ঢুকে বরাবর তাঁকেই প্রধান শিক্ষকরূপে, প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ বা অধিদেবতারূপে পেয়েছি। তাঁর পিতৃদেব অম্বিকাচরণ সেনও গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করে পরে খুলনায় ব্যবহারাজীব ও উকিল-সরকার হয়েছিলেন। পিতামহ তারিণীচরণ সেনও আমাদের অঞ্চলে একজন ক্রিয়ান্বিত সদাশয়' ব্যক্তি ছিলেন। পিতৃব্য খ্যাতনামা প্রমদাচরণ সেন 'সখা ও সাথী' সম্পাদক—প্রথম যুগের শিশুসাহিত্যের প্রবর্তক। এই বংশেরই খ্যাতিমান ইংরেজির অধ্যাপক ত্রিগুণাচরণ সেন দীর্ঘকাল রিপণ কলেজে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজির অধ্যাপনা করেছিলেন। এক সময় তাঁর "CHILD'S OWN BOOK" প্রথম-স্তরের ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। হাইকোর্টের বাগ্মী ব্যবহারাজীব বঙ্কিমচন্দ্র সেন, খুলনার উকিল-সরকার রায়বাহাদুর বিপিনচন্দ্র সেনও এঁদের জ্ঞাতি। লালদীঘিতে স্ব-নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে যে-বিপ্লবী যুবকের প্রাণান্ত হয় সেই অনুজাচরণ সেনও নেপালবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

পুরুষানুক্রমে সম্ভ্রান্ত ভক্তিমান্ সুশিক্ষিত পরিবার। ক্রিয়াকলাপে, দানধ্যানে, পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে এই পরিবারের সুনাম কয়েক পুরুষ ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সেন উপাধির সঙ্গে এঁরা বংশগত বক্সী উপাধিতেই দেশে পরিচিত ছিলেন। হেডমাস্টার নেপাল বকসী মহাশয়ের আসল নাম ত্রিপুরাচরণ সেন। এঁদের নাম, আকৃতি ও চরিত্রে যেন সেকালের শক্তিভক্তি ও ভরসার একটি ছাপ ছিল। শুনেছি, নেপালবাবু ছিলেন বি-কোর্সের অর্থাৎ বিজ্ঞান ও গণিত শাখার বি. এ.। অঙ্কেরও যে তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন, একথা টের পেত মুষ্টিমেয় ক'টি ছেলে উপরের দুই শ্রেণীতে যারা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অতিরিক্ত গণিত নিয়ে পড়ত। কিন্তু তাঁর মুখ্য পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা ছিল ইংরেজির সুশিক্ষক হিসাবে। দেশে যখন নোট-বই বেশী ছিল না তখন প্রবেশিকা-পাঠ্য HUNTER'S READINGS-এর একখানি সুন্দর নোট-বই তিনি লিখেছিলেন। অতি উঁচুদরের অথচ প্রাঞ্জল ইংরেজিতে রচিত সে ব্যাখ্যাপুস্তক। স্যার আশুতোষের আহ্বানে কোলকাতায় সিনেট হলে অনুষ্ঠিত প্রথম হেড-মাস্টারদের সম্মেলনে প্রদত্ত নেপালবাবুর সারগর্ভ বক্তৃতা স্যার আশুতোষের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

তাঁর ইংরেজি-পাঠনার বৈশিষ্ট্য কলেজে এসেও আমরা ভুলতে পারিনি। এমন সহজ অথচ বিশুদ্ধ ভালো ইংরেজি তিনি বলতেন ও লিখতেন যা ইংরেজি শিখবার দিকে আমাদের প্রেরণার একটি সজীব উৎস হয়েছিল। আমাদের লিখিত এবং তাঁর সংশোধিত রচনাবলী প্রমাণিত করত, পরকীয় ভাষায় প্রথম শিক্ষার্থীদের তিনি কতো বড়ো নিষ্ঠাবান্ এবং সুদক্ষ শিক্ষক ছিলেন। চারিত্র-নীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল বলিষ্ঠ! ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রগঠনের প্রতি তাঁর অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তখনকার দুর্নীতিপরায়ণ যে দু'একটি ছাত্র সমস্ত বিদ্যালয়ের আবহাওয়াকে দূষিত করে দেবার উপক্রম করত তাদের ইনি কঠোরহস্তে দমন করতেন। কায়িক শাস্তিদান করতে এই সুশান্ত মানুষটিকে দেখেছি মাত্র দু'একবার। সে যেন সংহারমূর্তি। প্রচণ্ড নিষ্ঠুর বেত্রাঘাত করে শুধরে দিয়েছিলেন অতি-দুর্বিনীত নৈতিক অপরাধে অপরাধী ছাত্রকে। সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিবেশ তাতে সুন্দর, সংযত ও শ্রীময় হয়ে উঠেছিল। 'Spare the rod and spoil the child'-নীতি সর্বজন-গ্রহণীয় না হলেও এর মূলে কিছু সত্য আছে তা তাঁর মতো সুশান্ত ও স্নেহশীল আচার্যের সাময়িক কঠোরতা আমাদিগকে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বে দু'টি বছর দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে তাঁর কাছে

ইংরেজি ও ঐচ্ছিক গণিত পড়বার প্রতীক্ষিত সৌভাগ্যের উদয় হ'ত—তার আগে নয়। কিন্তু স্কুলের সকল শ্রেণীর ভালো-মন্দ সকল ছাত্রের তিনি সব খোঁজ রাখতেন। আমাদের সময়ে প্রাক্-প্রবেশিকা অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুইটি ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচন করতে হ'ত। ইতিহাস, অতিরিক্ত গণিত ও অতিরিক্ত সংস্কৃত, আমাদের স্কুলে এই তিনটির মধ্যে যে-কোনও দুইটি বেছে নিতে হত। পূর্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আমাদের ইংরেজির অন্যতম পূজনীয় শিক্ষক যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে একরকম জিদ্ করে আমাকে অতিরিক্ত অঙ্কের বদলে ইতিহাস নিতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহাসে অনেক নম্বর পেলেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাৎসরিক পরীক্ষায় ইতিহাসে খুব ভালো নম্বর পেলাম না। অধিকন্তু অতিরিক্ত গণিত না নিয়েও আবশ্যিক গণিতে আশাতীত-ভাবে অনেক বেশি নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলাম। হেডমাস্টার মহাশয় এবং অপরাপর শিক্ষকমণ্ডলী আমার অতিরিক্ত গণিত না-নেওয়া ভুল হয়েছে, এবারে সে-কথা আর একবার জোর করে বললেন।

বক্‌সি-বাড়ীতে (বোধ হয় বগুড়ার স্বনামখ্যাত উকিল গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের শ্রাদ্ধে) ব্রাহ্মণভোজনে গিয়ে আমরা পরিতোষপূর্বক ভূরিভোজন প্রায় সমাধা করে এনেছি। পংক্তি ছেড়ে উঠতেই কালিয়াগ্রামের প্রবীণ পরেশনাথ দাশ মহাশয়, আমার মামাবাড়ীর প্রতিবেশী বললেন,—ভাগ্নে, তোমার আজিমার (মাতামহীর) খুব অসুখ। মা'কে একবার দেখিয়ে নিয়ে এস। হেডমাস্টার মশাই ও বাবা কাছেই ছিলেন। ক্ষিপ্রভাবে ব্যবস্থা হ'ল। আমি বাড়ী ছুট্ দিলাম। মুখের কথা শেষ হ'তে-না হ'তে মা আমার ছোট বোন্‌টিকে কোলে নিয়ে রোগশয্যাশায়িনী বৃদ্ধা মাতাকে দেখতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আমার পিছনে ছুটলেন গ্রামের স্টিমার ঘাটের দিকে। মাঝপথে হুইসেল শুনে বুঝলাম সেনহাটির ঘাটে ষ্টিমার এসে ভিড়েছে। দুরন্তভাবে ছুটে ঘাটে এসে দেখি, ষ্টিমারের সিঁড়ি তুলে ফেলা হয়েছে। টিকেট-মাস্টার মশাইয়ের সৌজন্যে আবার সিঁড়ি নামিয়ে মাকে ও আমাকে তুলে নেওয়া হল। দেখলাম স্টিমারের নাম গণেশ। সিদ্ধিদাতা যেন আমার মায়ের মাতৃদর্শনের শেষ কামনা পূর্ণ করলেন। বৃদ্ধা মাতামহী সেযাত্রা রক্ষা পেলেননা, সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করলেন। শেষরাতে তাঁর শববাহী আত্মীয়দের সঙ্গ ধরে কালিয়া স্টিমার ঘাটে এসে একাকী সেনহাটি-খুলনাগামী স্টিমার ধরলাম এবং সকালে এসে সেনহাটির ঘাটে নামলাম।

ভৈরবনদের পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি বাঁকের ওপর সেনহাটি গ্রাম অবস্থিত। নদীতীরে সারি সারি সাজানো ছবির মতো ডাকঘর, সরকারি ডাক্তারখানা, সম্ভাবশতকের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'বিকশিত কামিনীকুসুম তরুতল', শ্মশানঘাট, বাজার, হাইস্কুল, জমিদারের কাছারি। সকালে ডাকের চিঠি সংগ্রহের উপলক্ষ্যে গ্রামবাসীরা নদীর ধারে সমবেত হন। স্টিমার থেকে নেমেই দেখি নগ্নপদে আর্দ্রগাত্রে স্বয়ং হেডমাস্টার মহাশয় স্ব-মহিমায় বিরাজিত। আমাকে দেখে ঈষৎ হেসে আমার মাতামহীর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। খবর শুনে আমাকে সময়োচিত সান্ত্বনা দিলেন। পরে বললেন,—সময় বেশি নেই বলে একটা কাজের কথা তোমাকেই বলি (তুই ও তুমি, দু'টি সম্বোধনই তিনি সমান মধুর করে আমাদিগের প্রতি প্রয়োগ করতেন—তুইটি স্নেহাতিশয্য প্রকাশকালে)। বাড়ীতে গিয়ে বাবাকে বলবে, তোমাকে এখনই ইতিহাস ছেড়ে অতিরিক্ত অঙ্ক নিতে হবে। চার পাঁচ মাসে দু'বছরের পড়া পড়তে হবে। তা না হলে তোমার সরকারি বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে যাবে। আমি তোমাকে অতিরিক্ত অঙ্কের পড়াটা দেখিয়ে দেব। তার জন্যে আমার বাড়ীতে এসে তোমাকে থাকতে হবে। তোমাদের পাড়া থেকে এক মাইলের ওপর হেটে রোজ সকাল সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে এসে আমার সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে না। শরীর তো তোমার ভালো না। ভেবেছি, অন্নদা-কাকারা পূজোর পরে কোলকাতায় চলে যাবেন। তাঁদের বড়ো ঘরে তুমি থাকবে। কাছে কাজড়িপাড়ায় তোমাদের গুরুঠাকুর বাড়ীতে খাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে বাবাকে বলবে। বলো, আমি বলে দিয়েছি।

তক্ষুণি ছুটে এসে বাবাকে হেডমাষ্টার মশাইয়ের প্রস্তাবটি জানালাম। বাবা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্মত হয়ে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। ক'দিনের মধ্যে পূজো ও গ্রামের থিয়েটার শেষ করে অন্নদা-বক্সি মশাইরা কোলকাতায় চলে গেলেন। তাঁদের শূন্য সুবৃহৎ আটচালা ঘরে এসে আমি আশ্রয় নিলাম। সন্ধ্যার পরে লণ্ঠন নিয়ে প্রথম প্রথম নিজে সঙ্গে গিয়ে হেডমাস্টার মশাই অদূরবর্তী ঠাকুরবাড়ী থেকে আমাকে খাইয়ে আনতেন। সন্ধ্যার পরেই সন্ধ্যাবন্দনা সেরে আমাকে অঙ্ক দেখিয়ে দিতেন। তাঁর পদ্ধতিটি ছিল নূতন ধরনের। একদিন বসে ভালো করে আমাকে Arithmetical Progression বুঝিয়ে দিলেন ও সব রকমের কিছু অঙ্ক ধরিয়ে দিলেন। পরদিন আমাকে সময় দিলেন।

আমাকে দিয়ে কালীপদ বসু ও যাদব চক্রবর্তীর বীজগণিতের এই পর্যায়ের সব অঙ্কগুলি করিয়ে নিলেন। দু'চারটা যা পারিনি তৃতীয় দিনে তাঁর কাছে গিয়ে বুঝে নিলাম। সেইদিনই আবার Geometrical Progression ধরিয়ে দিলেন। এইভাবে অতিরিক্ত গণিতের সমস্ত পাঠক্রম আমার আয়ত্তের বিষয় করে দিয়ে ঘাড়ে ধরে আমাকে দিয়ে সব অঙ্ক করিয়ে নিলেন।

তখন আমি ছিলাম খুব হেংলা, লম্বা, রোগাটে। ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগতাম —সর্দিকাশীর আক্রমণ লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে দেখতাম, আমাদের গৃহচিকিৎসক গ্রামের প্রবীণ সুচিকিৎসক কবিরাজ প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরামর্শ করছেন হেডমাস্টার মশাই। একদিন বিকালের দিকে হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়ীতে নিবিষ্টমনে জ্যামিতি পড়ছি। দেখি, পাশে আমার গুরুপত্নী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এর আগে তাঁকে এত কাছ থেকে দেখি নি। মা-টি আমার বেরুতেন না, বড়ো লজ্জাশীলা সুগৃহিণী ছিলেন তিনি। আজ সর্বপ্রথম অন্নপূর্ণা-মূর্তি প্রত্যক্ষ করলাম। হাতে বড়ো চিনফয়লা কাঁসার বাটিতে ঘন-জ্বাল-দেওয়া একবাটি দুধ, আধসেরের বেশি। আর একখানি রেকাবিতে কয়েকখানি বাতাসা। বললেন, বাবা রোজ বিকালে এইটুকু করে দুধ তোমাকে খেতে হবে। তুমি রোগা ছেলে। মাথার কাজ বেশি করতে হচ্ছে—চোট্ পড়ছে বেশি। "না-না" একটু করলাম। কিন্তু সেই মাতৃ-মূর্তির কাছে অবাধ্যতার অবকাশ ছিল না। বাতাসা দিয়ে না খেলে অম্বল হতে পারে। বৈদ্য-ঘরের মেয়ে আমার গুরুপত্নী—এই কথাটা বাতলে দিয়ে আমাকে একবাটি দুধ ও এক গেলাস জল খাইয়ে তিনি গৃহকর্মে ফিরে গেলেন। পাঁচমাস ওঁদের বাড়ীতে ছিলাম। প্রতিদিন একবাটি দুধের বরাদ্দ ছিল।

হেংলা পরের ছেলেটিকে দেহে মনে ও নৈতিক ভাবে শক্তিমান করে এই দম্পতী স্বগৃহে লালিত করেছিলেন পাঁচটি মাস। প্রবেশিকার অতিরিক্ত গণিত আমার ক্ষিপ্রভাবে আয়ত্ত হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত বহু-প্রত্যাশিত একটি সরকারি বৃত্তিও পেলাম তাঁদেরই প্রসাদে। গেজেটে প্রকাশিত সেই সামান্য কৃতিত্বের খবর এক সুপ্রভাতে তাঁরই প্রেরিত লোক নিয়ে এল আমাদের বাড়ীতে বাবার কাছে। আমাকে নিয়ে বাবা তৎক্ষণাৎ হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়ীতে হাজির হলেন। পিতৃযুগলের আনন্দমিলন প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেদিন। একজন ছাত্রবাৎসল্যে আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত, আর একজন কৃতজ্ঞতার আনন্দে

পরিপূর্ণ। প্রতিবৎসর অপরপক্ষীয় তর্পণাবসানে আমার পঠিত একটি প্রণাম-মন্ত্র সজীব হয়ে তাঁদের মূর্তিপরিগ্রহ করে ধীরে ধীরে মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়।

"পিতৄন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥

ঋণভার

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে খুলনা শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় দৌলতপুর কলেজ। ভৈরবনদের সেনহাটির সমান্তরাল-বাহী পূর্ব-পশ্চিম বাঁকটি এখানে ঘুরে উত্তরবাহী হয়ে বয়ে গেছে। বাঁকের উপরেই দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরে কয়েকশত বিঘা জমির উপর দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির ৺দধিবামন দেবের মন্দির, টোল, কলেজগৃহ, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রদের স্বল্পব্যয়ে বাসোপযোগী নানাশ্রেণির ছাত্রাবাস, পুকুর, খেলার মাঠ, বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাগার, ফুলের বাগান, সবজির ক্ষেত প্রভৃতি অবস্থিত। অদূরে কোলকাতা-খুলনাগামী রেলপথ। কলেজের একই পারে খালিশপুর-মহেশ্বরপাশা, দেয়ানা-পাবলা, অপর পারে সেনহাটি-চন্দনীমহল, দেয়াড়া-দিঘলিয়া, ঘোষগাতি-বারাকপুর প্রভৃতি নদীমাতৃক গ্রাম। কলেজের অধিকাংশ পড়ুয়া এই সমস্ত গ্রাম থেকে আসে অথবা বাইরের নানাস্থান থেকে এসে এই সমস্ত গ্রামে ভদ্র পরিবারের আশ্রয় পেয়ে দৌলতপুর কলেজে স্বল্প ব্যয়ে বি. এ., বি. এস. সি. পর্যন্ত পড়তে পারে। যশোহর-খুলনা, বরিশাল-ফরিদপুর, এমন কি নোয়াখালি- চট্টগ্রামের ছাত্রেরাও দৌলতপুর কলেজে গ্রাম্য পরিবেশে পড়তে আসত। খুলনার ভৈরবতীরের গ্রামসমূহ শিক্ষাদীক্ষায় অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল উচ্চশিক্ষার এই গ্রামীণ কেন্দ্র, নূতন-পুরাতনের এই সংযোগসেতু। এই প্রতিষ্ঠান খুলনার গৌরব প্রখ্যাতনামা মনীষী ব্যবহারাজীব ব্রজলাল শাস্ত্রীর অবিস্মরণীয় কীর্তি।

কলেজ-স্থাপনে ব্রজবাবুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ-প্রমুখ

ব্যক্তির নাম স্মরণীয়। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, শুনেছি, বি-কোর্সের অর্থাৎ বিজ্ঞান-পাঠক্রমের বি. এ. ছিলেন। বাইরে কোনও স্কুলে তিনি ছিলেন হেডমাস্টার। কলেজ-প্রতিষ্ঠার সময় ত্যাগবুদ্ধি নিয়ে অতি স্বল্পবেতনে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ইতিহাস তাঁর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধীত ও অনুশীলিত বিদ্যা নয়। ইতিহাসচর্চ্চার পথ তিনি নিজে বেছে নিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি গ্রীস ও রোমের ইতিহাস অধ্যাপনা করতেন। তিনি শুধু ইতিহাসের একজন কৃতী ও নিষ্ঠাবান্ অধ্যাপক ছিলেন, তা নয়। একজন সত্যকার ঐতিহাসিক ছিলেন তিনি। আমরা কলেজে ঢুকবার আগে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়। "বাঙালীর ইতিহাস চাই"—বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশপ্রেমের উন্মাদনাময় তাগিদে যে ক'জন নিষ্ঠাবান্ ইতিহাসকর্মী বাংলার প্রকৃত ইতিহাস-সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, সতীশচন্দ্র মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এঁরা চিরস্মরণীয়। সতীশবাবু খুলনার দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য সুন্দরবনে বহু বৎসর নির্ভীকভাবে ভ্রমণ করে "যশোর নগরধাম প্রতাপ-আদিত্য-নাম মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ" –প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেন। যশোহর-খুলনার সদর ও মহকুমার সমস্ত মহাফেজখানায় দীর্ঘকাল তিনি নথিপত্র ঘেঁটে সরকারি মানচিত্রাবলী এবং কুলজী গ্রন্থাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল যশোহর-খুলনার ইতিহাস।

সারা দেশের ঐতিহাসিক ও সুধীমণ্ডলী এই আঞ্চলিক ইতিহাসকে অকুণ্ঠ প্রশংসায় অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ থেকে যশোহর-খুলনার গ্রামসমূহের নাম ছড়ায় গেঁথে ভাটিয়ালি সুরে গাইত স্কুল কলেজের পড়ুয়ারা। যশোহর-খুলনার ইতিহাস ছাড়া অধ্যাপক মিত্রের 'সপ্তগোস্বামী', 'যবন হরিদাস', 'অদ্বৈত প্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের সমাদর লাভ করে-ছিল। সাহিত্যিক প্রতিভা ও কবিব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি 'উচ্ছ্বাস'-গ্রন্থে। ব্রজলাল শাস্ত্রী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, স্যার যদুনাথ সরকার, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন-প্রমুখ দেশবরেণ্য মনীষী ব্যক্তি অধ্যাপক মিত্রের গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐতিহাসিক প্রতিভা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিত্বের অনেকগুলি

দিক্ ছিল। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক ও রসগ্রাহী ব্যক্তি। তাঁর স্বধর্মানুরাগী ভক্ত পরিচয় তাঁর অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন কঠোর নীতিবাদী, অথচ ছাত্রবৎসল স্নেহশীল ব্যক্তি। জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যার প্রভাব তাঁর অগণিত ছাত্রের মনে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে যেত। খুলনার অদূরে বেলফুলিয়া গ্রামে ছিল তাঁর নিবাস। গ্রামকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। গ্রামের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় যোগ।

দৌলতপুর কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা ছাড়া গ্রন্থাগারিকের অতিরিক্ত কাজটি তিনি ভালবেসে নিষ্পন্ন করে যেতেন বিপুল পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে। গ্রন্থাগারিকের পদের উপযুক্ত বেতন দেওয়ার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা দৌলতপুর কলেজের ছিল না। গ্রন্থাগারটি সতীশ বাবুরই সৃষ্টি। এই অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকের কড়া নজর থাকত কোন ছাত্র কি বই পড়ে। রুচিগঠন ও অধ্যয়নপিপাসার সঞ্চার করে দিতেন তিনি ছাত্রসম্প্রদায়ের। অনধিকারীর হাতে অবাঞ্ছিত গ্রন্থ দেখলে তিনি কেড়ে নিয়ে ছাত্র ও সহায়কদের ধমক দিয়ে শক্তিসামর্থ্য, প্রয়োজন ও প্রবণতার অনুযায়ী গ্রন্থ নির্বাচন করে দিতেন। গ্রন্থাগারিকের বিদ্যাবত্তা, ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক-প্রধানদের মতো হওয়া চাই। তা আমরা অধ্যাপক মিত্রের সংস্পর্শে এসে কলেজ-জীবনের প্রথমভাগে উপলব্ধি করেছিলাম।

ইণ্টারমিডিয়েট পাঠক্রমে ইতিহাস আমার নির্বাচিত বিষয় ছিল না বলে অধ্যাপক মিত্রের ক্লাসের সাক্ষাৎ ছাত্র হওয়ার বহু-প্রত্যাশিত সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছিলাম! প্রথম দিন ভর্তি হতে গেলে পূজনীয় অধ্যক্ষ দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে যাঁরা উপবিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন-সক্রান্ত 'দিব্যজীবন' 'পূর্ণযোগ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা অধুনা পণ্ডিচেরি-আশ্রমবাসী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক হেমেন্দ্রকিশোর দত্ত। সামান্য সরকারি বৃত্তি পেয়ে কলেজে ঢুকবার সময় পুজ্যপাদ অধ্যাপকবৃন্দের প্রত্যেকের যে সস্নেহ অবধান ও স্নেহানুকম্পা লাভ করেছিলাম তা ভাবতে গেলে অভিভূত হয়ে যাই। অধ্যাপক মিত্র তদবধি আমাকে স্নেহাশ্রয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া নির্ধারিত পাঠক্রমের বাইরে বাংলা পড়াবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে আমাদের ক্লাসে আসতেন। তখন

নিয়মিত বাংলার ক্লাস হ'ত না, বাংলার কোনও পাঠ্যপুস্তক ছিল না। মনে আছে, ভিনসেণ্ট স্মিথের প্রসিদ্ধ ভারতেতিহাস হাতে করে অনেকদিন তিনি ক্লাসে আসতেন। সেই গ্রন্থের উপাদেয় অংশ থেকে একটি একটি করে ইংরেজি বাক্য তিনি পড়ে কিছুক্ষণ থামতেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যে ঐ-বাক্যটি না লিখেই আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ তার বঙ্গানুবাদ করে খাতায় লিখে যাবার নির্দেশ দিতেন। একটি বাক্য শেষ করে আর একটি বাক্য পড়তেন। এইভাবে তিনি অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা ও ইংরেজির ভাষাজ্ঞান এবং ইতিহাসের অবিস্মর্তব্য অধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতেন। তাঁর শেষ বাক্যটি সমাপ্ত হ'তে-না হ'তে আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'ত, কে সর্বাগ্রে গিয়ে তাঁর কাছে সাহস করে খাতা পেশ করতে পারি। ১৯১৮ সালের প্রথম ভাগে স্যাডলার কমিশন দেশময় সফর করেন। তখন একদিন সকালে রেল স্টেশনের অদূরে দৌলতপুর কলেজের কাছে এসে রেলগাড়ি হঠাৎ পথের মাঝে থেমে গেল। সেখানেই গাড়ী হ'তে নামলেন, স্যার মাইকেল স্যাডলার, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডি. পি. আই. হর্ণেল ও জিয়াউদ্দীন আহম্মদ। কমিশনের সদস্যেরা যে ক'টি ক্লাসে পড়ানো শুনে খুশী হয়েছিলেন অধ্যাপক মিত্রের ক্লাস ছিল তার মধ্যে একটি।

কোলকাতায় বি. এ. পড়তে আসবার সময় অর্থাভাবক্লিষ্ট এই সংগ্রামী ছাত্রকে সহায়তা করবার জন্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে অধ্যাপক মিত্র যে সপ্রশংস পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন তার ভাষা এখনও ভুলতে পারিনি। জীবন-সংগ্রাম-রত ছাত্রেরা যখন আমাদের কাছে প্রশংসাপত্র চাইতে আসে তখন মহাপ্রাণ ছাত্রবৎসল আচার্যদেবের স্নেহস্মৃতি জেগে ওঠে ও কর্তব্যের নির্দেশ দেয়। কোলকাতায় কঠোর সংগ্রাম করে বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে যতদিন বি. এ. ও এম. এ. পড়েছি ততদিন ছুটিতে বাড়ী গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত আমাদের। আমাদের সব খবর তিনি রাখতেন—ভালো খবর পেলে আনন্দে অধীর হতেন। মনে আছে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার খবর টেলিগ্রাম করে বাবাকে জানাই। টেলিগ্রাফ-অফিসের পিওন দৌলতপুর হাটে আমাদের এক নিকট আত্মীয়ের কাছে সেই তারবার্তা বিলি করে। হাটে উপস্থিত অধ্যাপক মিত্র বৃত্তান্ত শুনে হাটশুদ্ধ নানাশ্রেণীর অসংখ্য লোকের মধ্যে একটা আনন্দের কলরোল তুলে তাঁর অকপট ছাত্রপ্রীতি ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

চাটগাঁয় সরকারি কলেজে দু'বছর চাকরি হয়েছে। গ্রীষ্মাবকাশের শেষের দিকে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। কোলকাতায় তিনমাস চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের পরে বাবার মৃত্যু হয়। আমার পিতৃদেব পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে সুপরিচিত বদান্য মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাই কোলকাতায় বা আমার কর্মস্থল চট্টগ্রামে আয়োজন না করে নিজগ্রাম সেনহাটিতে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করি। শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়ায় বাবার বিশ্বাস ও নিষ্ঠার মর্যাদা রক্ষার জন্য শ্রাদ্ধকার্য সসৌষ্ঠবে সম্পন্ন করবার যথারীতি দীন আয়োজন করি। নিজগ্রামের সামাজিকবৃন্দ ছাড়াও দৌলতপুর কলেজের পূজনীয় অধ্যাপকবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য দশাহকৃত্য সম্পন্ন করার পরই কলেজে উপস্থিত হয়েছিলাম। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক-পণ্ডিতেরা পূর্বেই পত্রীযোগে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষে গিয়ে আমার সময়ের অধ্যাপকদিগের সাক্ষাৎকার লাভ করলাম। নতুন অধ্যাপকদেরও পরিচয় পেলাম। অধ্যাপক মিত্র তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আমার নিজের অধ্যাপকদেরকে, না সমস্ত অধ্যাপক ও অপরাপর কর্মিবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করব, মতিস্থির করে উঠতে না পেরে দ্বিধায় পড়েছি। এমন সময়ে দূর থেকে একটি স্নেহার্দ্র গম্ভীর পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম। অধ্যাপক মিত্র আমার আসবার খবর পেয়ে দোতলার গ্রন্থাগার কক্ষ থেকে ছুটে নেমে আসছেন। মুখে আমার নাম, ঝড়ের মতো এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ; এক নিশ্বাসে বলে চললেন,—

তাই বল। খবর পেলাম কে একজন প্রফেসার মাথা-কামানো পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন কলেজে। আমি ভাবলাম, আমাদের জনার্দন ছাড়া আর কেউ নয়। চক্রবর্তী মশাই গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করেছেন, সে খবর যথাসময়ে পেয়েছি। আমাদের দেশের একটি গৌরবচূড়া খসে পড়েছে। একবার শুনেছিলাম, তুমি গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধশান্তি করে চাটগাঁয় ফিরে যাবে। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। শ্রাদ্ধশান্তিতে তোমার বাবার নিষ্ঠা ও তাঁর দানধ্যানের কথা সকলেই জানে। তোমার মতো সুপুত্র দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে তাঁর শেষ কাজটুকু গঙ্গাতীরে করবে, এ হতে পারে না।

অনর্গল বলে চলেছেন আমার পরম শুভানুধ্যায়ী আচার্যদেব। তখন তিনি অসুস্থ। দীর্ঘকাল রোগভোগ করছেন। চোখমুখ ঈষৎ ফোলা। তিনি বলছেন—বাবা, শুনেছি, তাঁর চিকিৎসায় অনেক টাকাপয়সা খরচ হয়েছে। প্রচুর

ধার হয়েছে তোমার। পরদুঃখকাতর, বহুপোষ্য-প্রতিপালক ব্যয়শীল ব্যক্তি ছিলেন তোমার বাবা। কিছু ধারও তিনি রেখে গেছেন। পিতৃকার্যের আয়োজন তুমি যা করেছ তাতে এই ব্যাপারে তোমার আরও ধার হতে পারে। বড়ো সংসারের ও ক্রিয়াকর্মের দুর্বহ ভার তোমার কাঁধে পড়েছে। কিন্তু বাবা, আমি বিশ্বাস করি, এই ঋণ তোমার থাকবে না। তাঁর সুকৃতিতে আশীর্বাদে তোমার ঋণ শোধ হয়ে যাবে। "ন হি কশ্চিৎ কল্যাণকৃৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" আচার্যদেবের কণ্ঠে উচ্চারিত গীতার বাণী তাঁর বিশাল প্রাণের অনুভব-সমৃদ্ধ ও আশীর্বাদবাহী হয়ে সেদিন আমার সমগ্র অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করেছিল।

এর পরে আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন—তোমার নিজের অধ্যাপকদের তো নিমন্ত্রণ করবেই তুমি, তা-জানি, সংস্কৃতাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট প্রেরিত শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত তোমার নিমন্ত্রণ-পত্রী দেখে বড়ো খুশী হয়েছি। আমি একটি কথা বলি। তোমার সময়ে যাঁরা আসেননি এমন নতুন অধ্যাপক এবং আফিসের সহায়কবৃন্দ, এঁদেরও তোমার পিতৃকার্যে নিমন্ত্রণ কর, এটি আমার ইচ্ছে। দৌলতপুর কলেজের সবাই তোমাকে জানেন, ভালবাসেন। তোমার বাবা ছিলেন আমাদের দেশের শ্রী। আমি নিজে যে উপস্থিত থেকে তোমার শ্রদ্ধাযুক্ত পিতৃকার্য দেখে তৃপ্তিলাভ করব, তার সাধ্য নেই বাবা, এই আমার দুঃখ। দেখছ তো, হাত-পা ফোলা, শরীর দুর্বল, হাটতে কষ্ট হয়, বড় দুঃখ হচ্ছে যে কাছে গিয়ে বসে থাকতেও পারব না। কিন্তু আমার মন চলে যাবে, দেহটিই শুধু যেতে পারবে না। তোমার পিতৃকার্য সসৌষ্ঠবে সুনির্বাহ হবে। তোমার ঋণও শোধ হয়ে যাবে। আমি বলছি।

বলা বাহুল্য, তাঁর স্নেহের নির্দেশটি মাথা পেতে নিয়ে কলেজের অধ্যাপক ও কর্মিবন্ধু সবাইকে আমার পিতৃশ্রাদ্ধে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানাই। তাঁরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত ও পিতৃদায়মুক্ত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক মিত্র যেতে পারেন নি। সত্যই সশরীরে না হলেও আত্মিকভাবে তিনি উপস্থিত ছিলেন সেদিন এবং সমস্ত প্রাণমন দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি। তাঁরই আশীর্বাদে, পল্লীসমাজের অকস্মাদাগত সমস্ত দলাদলির সমাধান হয়ে আমার পিতৃকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। ধীরে ধীরে সমস্ত ঋণভার থেকে মুক্ত হয়ে আমি সংগ্রামসঙ্কুল জীবনে অগ্রসর হতেও পেরেছি। কিন্তু আচার্যদেবের নিকট আমার ব্যক্তিগত ঋণভার সম্পূর্ণ

অপরিশোধিত রয়ে গিয়েছে। আমার অপরাধের সেই কাহিনীটি নিজমুখে ব্যক্ত করে তাঁর অনির্বাচ্য ব্যক্তিমহিমার স্বল্পাংশও যদি প্রকাশ করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করব।

পিতৃকার্যের অবসানে চাটগাঁয় ফিরে যাবার প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদ নিতে যাই। এই সময়ে টাকা পয়সার টান পড়ে। সপরিবারে দূর প্রবাসে যাবার রাহা খরচ জোগাড় হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে সাধ্যমত কিছু ধারও দিলেন অযাচিতভাবে তিনি আমাকে। তার অল্প কিছুদিন পরে আর একবার ছুটির শেষে চাটগাঁয় ফিরবার সময় একই প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁরও ছিল না। তবুও টুকিয়ে-টাকিয়ে অর্থের প্রয়োজনটি তিনি সাধ্যমত নিষ্পন্ন করে দিলেন। সেদিন তিনি ছিলেন একটু বেশি অসুস্থ। শরীরের দ্রুত অবনতি হয়েছিল। সেদিন আবার ছিল তাঁর পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধতিথি। সেই উপলক্ষ্যে তিনি মন্ত্র পড়ছিলেন। আমাকে পেয়ে উল্লসিত হয়ে বললেন,—বাবা, তোমাকে আজ ভালো দিনে পেয়েছি। ব্রাহ্মণ তুমি। আমার পিতৃস্বর্গার্থে এখানে দুটি শাকান্ন গ্রহণ কর। বড় তৃপ্ত হব আমি। আত্মার তৃপ্তি হবে আমার স্বর্গত পিতৃদেবের।

বিকালে গাড়ী ধরে আমাকে সপরিবারে বেরুতে হবে। দুপুরে এখানে আটকা পড়লে অসুবিধা হতে পারে। এই অজুহাতে মার্জনা চেয়ে বিদায় নিলাম। আর একবার এসে তাঁর বাড়ীতে খাব, বললাম। বারংবার আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন আচার্যদেব,—বড় তৃপ্তি হত আমার, তুমি দুটো খেলে। আর কি তোমাকে পাব? এ-যোগাযোগ কি আর হবে? অপরাধ-ভারক্লিষ্ট প্রাণে সান্ত্বনার কিছু থাকে না, যখন ভাবি সেদিনকার স্নেহার্দ্র কণ্ঠের সেই উক্তি ছিল দ্রষ্টার বাণী। তার পরে আর সেই মহাপ্রাণ পিতৃকল্প আচার্যের দর্শনলাভ আমার ঘটেনি। অত্যল্পকাল পরে অনুজকল্প অধ্যাপক শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র মজুমদার (অধুনা ইটাচুনা কলেজের অধ্যক্ষ)-কর্তৃক সম্পাদিত কলেজীয় পত্রিকা 'দেবায়তন' পেলাম। দেবায়তন মর্মভেদী মহাপ্রয়াণ-বার্তা বহন করে এল, দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র ইষ্টনাম জপ করতে করতে সজ্ঞানে স্বর্গলাভ করেছেন। সাধন-দীপিত একটি মহৎ সারস্বত জীবনের অকালে অবসান ঘটেছে।

ক্লান্ত ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ

আমার তখন গুরুকুলে অবস্থান, গুরুগৃহবাস ও সমিদাহরণ পর্ব চলছে। বাগবাজার কাঁটাপুকুরে সাত নম্বর বিশ্বকোষ লেনে অধ্যাপক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গৃহে থাকি। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার সম্পাদন ব্যাপারে আমি তাঁর বৃত্তিভোগী সহায়ক।

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।"

আচার্যদেবের পক্ষে এ-কথা আক্ষরিক সত্য হয়ে উঠেছিল। এক-একদিন শেষ রাতে উঠে আমাকে নিচে থেকে ডেকে নিতেন তিনি। তখনই কাজ শুরু হয়ে যেত। কখনও তিনি বলে যেতেন, আমি লিখে যাচ্ছি। কখনও তিনি কাগজ ও পুঁথিপত্র ঘাটছেন, আমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন। হাতে-কলমে সম্পাদনা ও গবেষণার কাজ তিনি শিখিয়েছিলেন আমাকে। ছুটির দিনে দুপুরে খেয়েই কোন-কোন দিন বসে যেতাম দু'জনে। সাঁঝের বাতি জ্বলে উঠত, অবিশ্রাম কাজ চলত দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত। সারস্বত-সাধনায় তাঁর সর্বদাই ছিল সুযোগ, কোন দুর্যোগকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ তাঁর তিরোধানের পরে বলেছিলেন, মৃত্যুর দিনও তাঁর ডান হাতের আঙুলে কালির দাগ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি।

একদিন তাঁরই ভার-দেওয়া নানা কাজ সমাধা করে বাড়ী ফিরতে বেলা প্রায় দুটো বেজে যায়। ফিরে স্নানাহার করে বাইরের ঘরে একটু শুয়েছি। শ্রান্তিতে ঘুম এসে গিয়েছে। তাঁর একতলার বাইরের ঘরেই লোকজন আসতেন। আসবাবপত্রের বড়ো বালাই ছিল না 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ঐতিহাসিক বাঙালী অধ্যাপকের গৃহে। বড়ো দু'খানি চৌকি জোড়া-দেওয়া, উপরে মাদুর বিছানো। অসময়ে খেয়ে প্রায় চারটে পর্য্যন্ত সেখানে ঘুমিয়ে আছি। আমার জাগবার প্রতীক্ষায় বাইরের বারান্দায় পায়চারি করছেন আচার্যদেব। আমি উঠলে কাজে বসবেন আমাকে নিয়ে। সুপ্ত অবস্থায় তা অবশ্য আমি জানিনে। তাঁর তৈলবিহীন পক্ককেশ। মোটা ময়লা পৈতে মালার মতো গলায় দুলছে। গায়ের মাঝে-মাঝে খড়ি-ওড়ার মতো দাগ। আর্দ্রগাত্রে নগ্নপদে পায়চারি করছেন। চোখ দুটি দীপ্ত।

সেনহাটি গ্রাম থেকে আমার এক দূরসম্পর্কিত মামা এসেছেন বিশেষ প্রয়োজনে আমার খোঁজে। এসেই পাদচারণারত গৃহস্বামীকে বলে বসেছেন, "ঠাকুর, জনার্দন এই বাড়ীতে থাকে?" আচার্যদেবের মোটা পৈতে ও আর্দ্র-গাত্র দেখে গ্রামদেশাগত আমার প্রবীণ আত্মীয়টি তাঁকে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়ীর পাচক-ব্রাহ্মণ ঠাউরে নিয়েছেন। ঠাকুর' জবাব দিলেন, "আছেন। আপনাকে একটু বসতে হবে। তিনি ঘুমুচ্ছেন।" "ডেকে দাও তাকে," তাগিদ দিয়ে বললেন আমার আত্মীয়। 'ঠাকুর' এবারও বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন আপনি।" এবার ধমকের ভঙ্গিতে জোর গলায় আগন্তুক বললেন, "ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডেকে দাও না তুমি তাকে। আমার দরকার আছে। আমি তার মামা।" 'ঠাকুর' এবার কতকটা কৌতুক করবার জন্যে অভিনয় করে একটু সুর চড়িয়ে পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করলেন। আমার মামাটি এবার ধৈর্য হারিয়ে তাকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন। উত্তরে প্রশান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন—আপনাকে বসতেই হবে। ক্লান্ত ব্রাহ্মণের আমি নিদ্রাভঙ্গ করতে পারব না।

শেষ কথাটির রেশ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ত্রস্ত হয়ে বাইরে এসে দু'জনকে দেখে আমি সব বুঝলাম। আচার্যদেব হেসে বললেন, —এই যে দেশ থেকে তোমার মামা এসেছেন। আমার ওপর বড়ো চটেছেন তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইনি বলে। কিছুতেই এঁকে বসাতে পারিনি আমি। মামাটির তখন যা অবস্থা তা বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের ভুল ও ত্রুটি-স্বীকারের আয়োজন করতেই আচর্যদেব প্রসন্ন হাসি ও উদার সামাজিকতার দ্বারা গ্রামদেশাগত প্রবীণের সমস্ত শঙ্কা ও সঙ্কোচ দূর করে দিয়ে তাঁকে আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করলেন।

আচার্য দীনেশচন্দ্রকে অনেকে বলতেন ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। ঐতিহাসিক আলোচনাপ্রসঙ্গে কোন কোন স্থলে তিনি ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার কোন কোন বাস্তব ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা তাঁকে এই আখ্যায় আখ্যাত করতেন। কিন্তু তাঁর অন্নপুষ্ট ও স্নেহাশ্রিত এই ব্রাহ্মণবংশীয় জ্ঞানজ সন্তান মনেপ্রাণে জানে, দীনেশচন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী তো ছিলেন না, ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার এমন একজন বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা, গুণব্রাহ্মণ্যের আদর্শানুরাগী এমন ব্যক্তি আমি বেশি প্রত্যক্ষ করিনি। আমাদের কালের একজন মনীষীর এই সংস্কারের মূল্যনির্ধারণের দুঃসাহস আমার নেই। একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ

করেই আমি দায়িত্ব পালন করলাম। মহাপুরুষের মনুষ্যমহিমার কতটুকুই বা আমরা জানি? কতটাই বা বাইরে ব্যাবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষ করি? "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

এহো বাহ্য

বাংলা দেশের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রদের অন্ততঃ দু'পুরুষের কাছে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নামটির মহিমা অনির্বাচ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করে যাঁরা কৃতিত্ব ও পদমর্যাদার তুঙ্গস্থানে আরোহণ করেছেন এই নামটির শ্রবণ ও কীর্তনকালে তাঁদের অন্তর শ্রদ্ধাকৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, শির নুইয়ে আসে। ইংরেজি ভাষায় বাঙালীর অধিকার ও পাণ্ডিত্যের নানাদিক্ অবাঙালীদের প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্বের কোনও তুলনার স্থল এদেশে আছে, একথা অধ্যাপক ঘোষের বিশাল ও সুযোগ্য ছাত্রসমাজ মানেন না। একটি শ্রেষ্ঠ পরকীয় ভাষা ও সাহিত্যের মাধুর্য ও উৎকর্ষের যে অনুভব তাঁর আস্বাদ্য হয়ে সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত অন্তরে অনুরূপ সংবেদনের বিষয় হয়ে উঠেছিল সত্যই সেরূপ ঘটনা সাহিত্যের অধ্যাপনার ইতিহাসে বিরল। তাঁর উচ্চারণ-বিশুদ্ধি, ভাব-দীপিত পাঠ, প্রাণপূর্ণ আবৃত্তি, সুনিপুণ বিশ্লেষণ এবং অনুভব-সমৃদ্ধ ব্যাখ্যান যাঁরা একবার শুনেছেন তাঁদের কাছে অপরের অধ্যাপনা ভালো না লাগার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। শতাব্দীর প্রথম দশকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে প্রফুল্লবাবু কর্মজীবন আরম্ভ করেন। অচিরকালের মধ্যেই ভয়াবহ পরধর্ম পরিহার করে এই আজন্ম-সারস্বত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে স্বধর্মের পথে চলে আসেন এবং একই প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবনের অবশিষ্ট সমগ্র অংশ অতিবাহিত করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সুযোগ লাভ না করেও ছাত্রসংসদে লব্ধযশাঃ এবং শ্রুতকীর্তি এই অধ্যাপকের পাদমূলে স্বল্পদিনের জন্যে ছাত্ররূপে বসবার

সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। এর মূলে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার অদ্ভুতকর্মা স্যার আশুতোষ। স্নাতকোত্তর বিভাগে ভারতীয় ভাষাসমূহের পাঠনা ও এম. এ. পরীক্ষা-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যতালিকায় তিনি একটি অর্ধপত্র সন্নিবেশ করেন বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব (WESTERN INFLUENCE ON BENGALI LITERATURE)। কে পড়াবেন? কয়েক হাত বদলিয়ে ভার দিলেন তিনি অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ওপর। সকলের জানা না থাকতে পারে, অধ্যাপক ঘোষ শুধু ইংরেজি সাহিত্যের সুরসিক বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতাই ছিলেন না, তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর ভাষাতত্ত্ববিৎ ও বহুভাষাবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন; সংস্কৃতে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও অধিকার ছিল। পালি প্রাকৃত প্রভৃতি মধ্য-ভারতীয় ভাষায় তাঁর বিশেষজ্ঞ-জনোচিত জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল ছিল। সর্বোপরি জাতীয় সাহিত্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং বিশ্বাসে আচরণে বেশভূষায় কথাবার্তায় খাঁটি বাঙালীয়ানা তাঁকে এদেশের অপরাপর খ্যাতনামা ইংরেজির অধ্যাপকদের থেকে বিশেষিত করে রেখেছিল।

বাংলার এম. এ. ক্লাসে অধ্যাপক ঘোষকে পেয়ে আমরা আনন্দ-গর্বে অধীর হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আশা মিটিয়ে একবার তানলয়বিশুদ্ধ ভালো ইংরেজি শুনব। কিন্তু প্রথমদিন গলাবন্ধ কোট ও ধুতি পরে ক্লাসে এসে অধ্যাপক ঘোষ অনাড়ম্বর বাংলায় আমাদের বারো-চোদ্দজন পড়ুয়ার প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলাপ-পরিচয় শুরু করে দিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই রথ মাটি ছুঁয়েই চলল, দেখলাম! কোথায় আকাশছোঁয়া নৈর্ব্যক্তিক আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্যমহিমা? এ-যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লোকপাবন আন্তরিকতা। আমরা কে কি পড়েছি. কি পড়তে ভালবাসি, কেন ভালবাসি, এই সব কথা দিয়ে শুরু করলেন। আমার মনে আছে, মহাকাব্য সম্বন্ধে আমার পড়াশুনা আছে কি না, মধুসূদন-হেমচন্দ্রের মহাকাব্য-রচনার প্রয়াস সম্বন্ধে আমি কিরূপ ধারণা পোষণ করি, এই দুই কবির উপর বাংলা সমালোচনা-গ্রন্থ কি কি লেখা হয়েছে, পড়েছি কিনা, আমাকে এক এক করে এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করেন। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ও নগেন্দ্রনাথ সোমের মধুস্মৃতি, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কবি হেমচন্দ্র, মন্মথনাথ ঘোষের হেমচন্দ্র আমাদের সময়কার অবলম্বন ছিল। সবগুলির নাম করতেই খুশি হয়ে বললেন, "তোমরা দেখি সব পড়ে ফেলেছ। বেশ ভালো।"

দ্বিতীয় দিন এসে আবার মহাকাব্যের প্রসঙ্গ তুললেন। সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরীক্ষা করলেন। কাব্যাদর্শ ও সাহিত্যদর্পণের সংশ্লিষ্ট অংশ আমাদের কারো-কারো পড়া আছে দেখে খুশী হলেন। ইংরেজি ও ইউরোপীয় অন্যভাষার Epic সম্বন্ধে তিনি নিজেই সেদিন কিছু বললেন বাংলায়। জোসেফ্ এডিসনের SPECTATOR-ধৃত এপিকের আলোচনা আমাদের গোচর করলেন। কারের EPIC AND ROMANCE বইখানি পড়ে নিতে বললেন। তৃতীয় দিন মধুসূদনের বীরাঙ্গনার প্রসঙ্গে এলেন। ওভিদের নামটিই শুধু আমাদের জানা ছিল। HEROIC EPISTLES-এর নায়িকাদের শ্রেণীবিভাগ করে তাঁদের অনেকের পরিচয় দিলেন, তাঁদের সঙ্গে বীরাঙ্গনার নায়িকাদের কোথায় তুলনার অবকাশ আছে, সে-সম্বন্ধে পড়াশুনা ও চিন্তা করবার জন্যে নির্দেশ দিলেন। তারপর আর একটি দিন কিছু নোট্ দিলেন ওভিদের কাব্যগ্রন্থের নায়িকাদের লিখিত পত্রীর সারসঙ্কলন করে। নোট্ দিলেন উঁচুদরের ইংরেজিতে, চোস্ত ইংরেজের লেখা ইংরেজির মতো। এই চার-পাঁচদিন ক্লাস হওয়ার পর নোটিশ পেলাম, অধ্যাপক পি. সি. ঘোষ বাংলার ক্লাসটি নিতে পারছেন না। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে নানা কারণে অধ্যাপক ঘোষের বাংলা ক্লাস নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর সাক্ষাৎ-ছাত্রত্বের দাবি আমাদের মাত্র এই ক'দিনের। তাঁর সৌভাগ্যবান্ অন্তরঙ্গ ইংরেজির ছাত্রেরা বলবেন, 'এইমাত্র!' তার জন্যে এত আড়ম্বর! এহো বাহ্য। কিন্তু আমরা যেটুকু পেয়েছি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা প্রকাশ করতে হলে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বলতে হয়,

"যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।"

এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথমস্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করতে যাই। আনন্দ প্রকাশ করেন, আশীর্বাদ করেন অধ্যাপক ঘোষ। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের গৃহে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা হত। দরিদ্র কোন ছাত্রের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করবার জন্যে, অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করবার নিমিত্ত, এই দেশবিশ্রুত ইংরেজির অধ্যাপক নিরভিমান হয়ে সমকালবর্তী শিক্ষাকর্মীদের কাছে অনেক সময়ে যেতেন, দেখেছি। সে-যেন আর একটি মানুষ। ধনীর সন্তান, উচ্চ-পদস্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন সরকারী কর্মচারী অথচ বেশভূষায় কথাবার্তায় পরদুঃখকাতর

হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালী শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার সময় একবার তাঁকে পেলাম, সেখানে ইংরেজির এম. এ. পরীক্ষায় বহিরাগত পরীক্ষক হয়ে তিনি গিয়েছেন। সংস্কৃত-বঙ্গ বিভাগের অধ্যাপক-প্রধান ডাঃ সুশীলকুমার দের গৃহে দেখা হতেই বললেন, কি হে, তুমি নাকি বিলাত যাচ্ছ? কোথা হতে ভুল খবর শুনেছেন, অথবা অগণিত প্রখ্যাত ছাত্রের মধ্যে কারো সঙ্গে এই অখ্যাত অকৃতী ছাত্রকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

চাটগাঁ সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে প্রথম ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়ে (১৯২৯ ইং) পরীক্ষক-সভার কার্যাবসানে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে যাই। সরকারী কলেজে ছ'টি বাংলার অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ঈপ্সিত উপাধ্যায়ের পদটি আমি পেলাম না, ছিটকে পড়লাম একেবারে দেশের প্রত্যন্তভাগে পাণ্ডব-বর্জিত চাটগাঁয়। এ-জন্যে আফশোষ ছিল। অভিযোগটি অধ্যাপক ঘোষকে অকপটে নিবেদন করলাম। সব শুনে তিনি বললেন "ওহে, এখানে অবশ্য বাংলাটা ভালো জমছে না। তা হোক, বদলির জন্যে এখন তদ্বির করো না। তোমার হয়ত একদিন সময় আসবে। শুনেছি, চাটগাঁয় তুমি ভালো কাজ করছ। ধৈর্য ধরে ভালো মনে ভালবেসে কাজ করে যাও।" তাঁর সারগর্ভ উপদেশ ও অমোঘ আশীর্বাণী সফল হয়েছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমি পরে এসেছিলাম—সেখানে বঙ্গভারতীর সেবার শ্লাঘনীয় অধিকার এবং অভিজাত প্রতিষ্ঠানে মায়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ ও আত্মপ্রসাদ আমি লাভ করেছিলাম। কিন্তু শুভানুধ্যায়ী আচার্যদেবের কার্যকালে ও জ্ঞাতসারে নয়।

আর একবার চাটগাঁয় দেবপাহাড়ে প্রাতঃস্মরণীয় রাজেশ্বর গুপ্তের বাংলোয় বাসা নিয়ে আছি। পাহাড়ের একটু উপরিভাগে পার্সিভ্যাল-বাংলো। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক এইচ. এম. পার্সিভ্যাল, অধ্যাপক ঘোষের গুরু ও সহকর্মী, এই গৃহে বাস করতেন। তখনও তাঁর ভগ্নী সেই বাড়ীতে থাকেন। একদিন সকালে দেখি অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ পাহাড়ের গা বেয়ে পার্সিভ্যাল-বাংলোয় উঠছেন। ছুটে গিয়ে ধরলাম। প্রণাম নিবেদন করতেই বললেন, "তীর্থপর্যটনে এসেছি। জান তো অধ্যাপক পার্সিভ্যাল এই বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর স্বহস্ত-লিখিত টিপ্পনীতে সমৃদ্ধ তাঁর অনেক বহুমূল্য গ্রন্থ এই বাড়ীতে আছে। দেখি,

যদি এঁরা তাঁর নামে প্রেসিডেন্সি কলেজকে বইগুলি দেন।" ভক্ত শিষ্য-সহকর্মীর এই অভিযান সফল হয়েছিল। এখনও PERCEVAL COLLECTIONS প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব ও সম্পদ্-বর্ধন করছে।

সেবার তিনি চাটগাঁয় গিয়ে উঠেছিলেন, তাঁর আত্মীয় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ষড়্‌ভুজপ্রসন্ন মজুমদারের অতিথি হয়ে। ষড়্‌ভুজবাবুর প্রতিবেশী ও ভাড়াটিয়া আমার বন্ধু-সহকর্মী অধ্যাপক পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় কাছেই ছিলেন। পরেশবাবু অধ্যাপক ঘোষের বিশিষ্ট ভক্ত-শিষ্যগোষ্ঠীর অন্যতম। অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর পদ্মিনীভূষণ রুদ্র ও পরেশবাবুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়্‌ভুজবাবুর গৃহে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে দেখা করি। তিনজনই ইংরেজির কৃতী অধ্যাপক, মাঝখানে আমি বাংলানবিশ। ইংরেজি-পাঠনার রহস্য ও মর্মকথা সম্বন্ধে এই তিন অধ্যাপকের মধ্যে অনেক আলাপ হ'ল সেদিন। মনে আছে, প্রফুল্লবাবু সেদিন তাঁদের প্রশংসাবাণীর উত্তরে বলেছিলেন—নেশার মতো ইংরেজি-পড়ানো। ভালো লাগে, পড়িয়ে যাই। আমার মনে হয়েছিল, পরকীয়াভাষা পাঠনার আড়ালে আর একটি মানুষ ছিলেন, গভীর তত্ত্বদর্শী ও স্বধর্মানুরাগী। জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির মর্মগ্রাহী। তার প্রকাশ তাঁর অবিসংবাদিত সংস্কৃতানুরাগে, পালি-ভাষা ও বৌদ্ধসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণে, যার পরিচয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পিতৃদেব পুণ্যশ্লোক ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নামে বহু অর্থপ্রদানে ব্যক্ত হয়েছিল। অধ্যাপক ঘোষের এই দ্বৈত সত্তা—এই দু'টি মানুষের মধ্যে বোধ হয় সারাজীবন একটা দ্বন্দ্বের ফল্গু বয়ে চলেছিল। দু'টি মানুষই সমান শক্তিমান্, কেউ হটবার নন। অকপট সাধুতা ও আন্তরিকতা দুই ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। কে বহিরঙ্গ, কে অন্তরঙ্গ? কে বাহ্য, কে আভ্যন্তর? আমার মনে হয়, বলা তত সহজ নয়।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে স্মৃতিতর্পণ সাঙ্গ করি। আমার পিতৃদেবের কঠিন পীড়ায় কোলকাতা ক্যাম্পবেল হাসপাতালে খ্যাতনামা অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তি-কর্তৃক ১৯৩০ সালে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। সরকারী কলেজে বাংলার উপাধ্যায়ের আয় তখন ছিল দেড় শো' টাকা। বহু অর্থ ধার করতে হয়েছিল বাবার চিকিৎসার জন্যে। ভাই-শিবনাথের এম. এ. পরীক্ষা আসন্ন। তার পরীক্ষার ফি জুটতে পারছিনে। হঠাৎ কি মনে করে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে অধ্যাপক ঘোষের গৃহের দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে গুরুগৃহের প্রবেশপথে

শিবমন্দিরের সামনে দেখি, অর্ধমলিন ফতুয়া-গায়ে চটি-পায়ে ত্বরিত-পদে অধ্যাপক ঘোষ বেরিয়ে আসছেন। এই বেশে অনেক সময় তিনি কলেজ স্ট্রীটে ঘুরে ঘুরে ফুটপাথে ও পুরোনো বইয়ের দোকানে বই খুঁজে বেড়াতেন, দেখা যেত।—কি হে জনার্দন, কোথায় অভিযান করেছ এদিকে?—জিজ্ঞাসা করলেন। অভিবাদনান্তর সঙ্কোচের সঙ্গে তখনকার সমস্যাটি বিবৃত করলাম। একটু ভেবেই আমাকে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরলেন। বাইরের ঘরে ২।১ মিনিট অপেক্ষা করার পরেই দেখলাম, অধ্যাপক ঘোষ উপর থেকে নেমে এলেন। ফতুয়ার নিচুতে ট্যাঁকটা একটু উঁচু। সেখান থেকে খুলে গুণে দশখানি দশটাকার অর্ধমলিন নোট বের করে হেসে আমার হাতে দিয়ে বেরুবার উপক্রম করলেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষীণ প্রয়াস পেতেই থামিয়ে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষাকার্যে পরীক্ষকের মজুরি পেয়ে তাঁর ঋণ শোধ করব বলাতে বললেন, "তোমার এখনকার কাজ তো সেরে নাও। "Payable when capable". আমার প্রতিশ্রুতি নয়, তাঁরই নির্দেশই ফলেছিল। পরের বছর একবারে সব টাকা শোধ করতে পারিনি। দু'বছর দু'বারে ধার শোধ করতে হয়েছিল। আমরা যে অর্থনৈতিক সমস্যার যুগে বাস করি তাতে দশটি টাকা ধার দিতে অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও অনেক সময়ে ইতস্তত: করতে হয়।

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কত বড়ো ছিলেন, আমি জানি, তার পরিমাপ অথবা প্রতিপাদন করবার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু পরকীয় ভাষা ও সাহিত্যের কৃচ্ছ্রসাধ্য অধ্যাপনার আড়ালে যে বিশালপ্রাণ মানুষটি ছিলেন সেই ভূমার অধিকারীকে স্মরণ-বন্দন করে ধন্য হবার লোভ-সংবরণ করা এই অকিঞ্চনের পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। সেজন্য মার্জনা চাই।

বরণীয় তারা

"বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।"

আমার বাংলাদেশের সন্তান

সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃতে অনর্স সহ বি. এ. পড়বার সময় আমার পূজ্যপাদ প্রভাবশালী তত্রত্য দুই আচার্যের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের মাঝখানে আমাকে পড়তে হয়েছিল। একের তোষ ও অপরের রোষ তাঁদের অধম ছাত্রের শিরে বর্ষিত হওয়ায় কতকটা অজ্ঞতা-জনিত ভয়ে সংস্কৃতের অনর্স পরীক্ষাটা দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। যাকে 'ডিস্‌টিঙ্ক্‌শন' বলা হয় সেই পরিচয়ে তৃপ্ত হয়ে গ্রাজুয়েট হওয়া গেল। দেবভাষা ও রাজভাষা দুই-ই পড়তে ভাল লাগত, দুই-ই সমান মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলাম। তবুও বি. এ. পাশ করে উনিশ শো' একুশে ইংরেজির এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়া গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা সৌধের একতলার সুমুখের বারান্দার কাছে দক্ষিণদিকে স্নাতকোত্তর বিভাগের কার্যনির্বাহক অধ্যাপক ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আফিস ছিল। তাঁর ঘরের সামনে দর্শনার্থী হয়ে প্রতীক্ষা করছি, এমন সময়ে পূজ্যপাদ অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এসে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে তাঁর সঙ্গী প্রবীণ মাননীয় এক ব্যক্তিকে তাঁর নিজস্ব পরিহাস-রসিকের ভঙ্গিতে বললেন, "এই যে রায়-সাহেব নেকড়ে বাঘ, আপনার একটি ভালো শিকার।" গুরুবাক্য অবিকল প্রয়োগ করলাম। অপরাধ স্পর্শ করবে না, ভরসা করি। সঙ্গী প্রৌঢ় ব্যক্তিকে জীবনে আর কোনদিন চাক্ষুষ প্রত্যেক্ষ করা হয়নি। অতঃপর বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঝড়ের বেগে যে-কথাগুলি বলে গেলেন তাতে তাঁর সম্মানিত সঙ্গীর পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় আনতশির হলাম। তখন আগস্ট মাস হলেও লম্বা কোট-পরা, গলায় কম্‌ফর্টার-জড়ানো তাঁর বেশ। কাঁচাপাকা রুক্ষ চুল, প্রতিভাদীপ্ত আনন, উজ্জ্বল চক্ষু। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা ইতিবৃত্তকার ও সাহিত্যরথী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন (তখন রায়সাহেব)।

ফ্রি-স্টুডেন্টশিপের প্রার্থনা নিয়ে ডাঃ গৌরাঙ্গনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। তাই বি. এ. পরীক্ষার মার্ক-শীট হাতেই ছিল। ইংরেজিতে তিনশো'র মধ্যে পুরো দুইশো, সংস্কৃতে দুইশো পঞ্চাশ, বাংলায় একশো'তে বিরাশি। বিদ্যাভূষণ মশাই খপ্‌ করে মার্কশীটটি কেড়ে নিয়ে বললেন, "রায় সাহেব, দেখুন-

দেখুন, আমার ফাদারের নম্বরের বাহার, ইংরেজি-সংস্কৃতে ও বাংলায়। বাবাজি, খামাকা আমাদের 'জিনিয়াসে'র ভয়ে সংস্কৃতে অনর্স'টি দিল না। দিলে ওর প্রথম শ্রেণীর উচ্চস্থান রুখ্‌ত কে?"—ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর আমার দুই শিক্ষাগুরু—জীবনের দুই শুভগ্রহ—যা উপদেশ দিলেন তার মর্ম এই। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ (ভারতীয় ভাষাসমূহ) খোলা হয়েছে। ইংরেজির মেধাবী ছাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইংরেজি অনর্সে প্রথম স্থান অধিকার করেও বাংলার এম. এ. ক্লাসে যোগ দিয়েছেন। আমিও যেন ইংরেজির এম. এ. না পড়ে বাংলার এম. এ. ক্লাসে যোগ দিই। এই বলে বিদ্যাভূষণ মশাই পকেট থেকে চারটি টাকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এ বড়ো পিছলে জায়গা। এক্ষুণি বিষয় বদলাবার ফি জমা দিয়ে এস উপরে। তার আগে চল গৌরাঙ্গের কাছে তোমাকে পরিচিত করিয়ে দিই।" এই বলে আমার পরমারাধ্য গুরুদ্বয় আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কক্ষে। বিষয়-পরিবর্তন কায়েম হয়ে গেল। দু'দিন মাত্র ইংরেজির এম. এ. ক্লাসে পড়েছিলাম। একদিন প্রখ্যাতনামা ইংরেজির বিভাগীয় অধ্যাপক-প্রধান ডাঃ হেনরী স্টীফেন বড়ো কাচ গলায় ঝুলিয়ে বোর্ডে লিখে লিখে পড়িয়েছিলেন।

বাংলার এম. এ.-তে অপর একটি ভারতীয় ভাষাও নিতে হ'ত। তাতে থাকত দু'টি পত্র, দু'শো' নম্বর। হিন্দি, উর্দু, মৈথিল, উড়িয়া, আসামী, গুজরাতী, মারাঠি,সিংহলী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালি, কানাড়ি, বোধ হয় এই ক'টি তখন প্রবর্তিত হয়েছিল। বিদ্যাভূষণ মশাই-ই গুজরাতী নির্বাচন করে দিলেন আমার জন্যে। শুধু বিষয় নির্বাচন করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন না, তাঁর প্রকৃতিগত কর্মতৎপরতায় সঙ্গে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন দ্বারভাঙ্গা সৌধের একতলার পিছনের বারান্দায়। অধ্যাপকদিগের ক্ষুদ্র বিশ্রামকক্ষে সকলের স্থানসঙ্কুলান হত না। অনেক সময় প্রবীণেরা কেউ কেউ বাইরে বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে বসে পড়াশুনা করতেন। তাঁদের মধ্যে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, ডাঃ হীরালাল হালদার প্রমুখ মনীষীদেরকে দেখা যেত। সেখানে ঈজি-চেয়ারে অর্ধশয়ান অধ্যয়নরত গৌরবর্ণ রাশভারি দীর্ঘাকৃতি এক অবাঙালী অধ্যাপকের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে আমাকে পরিচায়িত করে বললেন,

"গুজরাতীর ক্লাসের জন্তে একটি ভালো ছাত্র এই নিন্, ডাঃ তারাপুরওয়ালা।" বলা বাহুল্য, তিনিই প্রখ্যাতনামা বহুভাষাবিৎ অধ্যাপক ডাঃ ইরাচ্ জাহাঙ্গীরজী সোরাবজী তারাপুরওয়ালা, বি এ., পি-এইচ, ডি, বার-এট্-ল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিভাগীয় অধ্যাপক-প্রধান। আমার বি. এ. পরীক্ষার মার্কশীটটি ছাত্রবৎসল বিদ্যাভূষণ মশাই নানা হাতে ঘুরিয়ে অবশেষে ডাঃ তারাপুরওয়ালাকেও দেখতে দিলেন। সস্মিতমুখে স্বনাম খ্যাত অধ্যাপক আমাকে তাঁর গুজরাতী ক্লাসের একতম ছাত্ররূপে অঙ্গীকার করে নিলেন।

তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক হলেও ডাঃ তারাপুরওয়ালা সংস্কৃত-বাংলা-ফার্সি-পালি প্রভৃতি নানাবিভাগের ছাত্রদের নিয়ে সপ্তাহে একটি বড়ো ভাষাবিজ্ঞানের সম্মিলিত সাধারণ ক্লাস নিতেন। দ্বারভাঙ্গা সৌধে ঢুকেই একতলায় উত্তরে ডানদিকের ঘরটিতে সেই বড়ো ক্লাসটি বসত। এ-ছাড়া তিনি আমার গুজরাতীর ক্লাস নিতেন সপ্তাহে দু'টি করে। মুখ্য-গুজরাতীর ছাত্র একজন গুজরাতীও সেই ক্লাসে থাকতেন। আর সেই সঙ্গে এসে যোগ দিতেন অতিরিক্ত জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসাবে আমার সংস্কৃত কলেজের সতীর্থ-সুহৃদ্, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সেবারকার প্রতিভাবান ছাত্র সুকুমার সেন (পরে প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন)। প্রথম দিনের গুজরাতী ক্লাসের একটি কৌতুকাবহ ঘটনা মনে আছে। গুজরাতী-হরফ অনেকটা দেবনাগরীর মতো। ডাঃ তারাপুরওয়ালা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমাদের পড়াতেন। অক্ষরপরিচয় ও ভাষাশিক্ষার জন্তে অযথা সময় নষ্ট না করে ক্ষিপ্রভাবে কাজচালানোর মতো পরিচয় লাভ করিয়ে নিয়ে প্রথমেই একখানি গুজরাতী উপন্যাস ও কবিতা-সংগ্রহ পড়াতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাস MILESTONES IN GUJARATI LITERATURE পড়তে বলেন। সেবারকার পাঠ্য একখানি উপন্যাস থেকে আমাকে পড়তে বলায় আমি প্রথম বাক্যটি পড়লাম, "গুজরাতনী জাহোজলালী'পর অন্ধকারনা বিস্মরণনা পরাধীনতানা থর পর থর চহ্ড্যা ছে" "গুজরাতের সমৃদ্ধির উপর অন্ধকার, বিস্মৃতি আর পরাধীনতার স্তরের পর স্তর জমেছে।" তার পরের বাক্যেই 'ইতিহাস' কথাটি প্রযুক্ত হয়েছিল। গুজরাতী 'ই' অনেকটা নাগর-বাংলা 'ঘ'-এর মতো। আমি অতর্কিতে 'ইতিহাসনা'র বদলে পড়ে গেলাম, 'ঘতিহাসনা'। প্রচুর হাস্ত

কৌতুকের মধ্য দিয়ে শুধরে দিলেন সহৃদয় অধ্যাপক। গুজরাতী ছাত্রবন্ধুটি (নামটি যতদূর মনে পড়ে, কান্তিলাল ধোলকিয়া) অতঃপর নির্ভুলভাবে বইখানি থেকে বাকি অংশ পড়ে গেলেন।

ডাঃ তারাপুরওয়ালা থাকতেন ধর্মতলা স্ট্রীটের 'মিণ্টো ম্যানসন্' নামক বাড়ীটির চতুর্থতলের একটি ফ্লাটে। আমি ও বন্ধু সুকুমার সেন প্রায়ই গুরুগৃহে যেতাম। অতি অমায়িক সুশিক্ষিত আদর্শ পার্সি পরিবার। আমাদের গুরুপত্নী, গুরুর বৃদ্ধা জননী, দু'টি শিশু পুত্র (একটির নাম বোধ হয় ছিল শ্যামল) আর অধ্যাপকের কনিষ্ঠ সহোদর ইতিহাসের অধ্যাপক, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ, ওয়াই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা—এই নিয়ে ছিল তারাপুরওয়ালা-পরিবার। ছোট ভাই ('ইয়াকুব' বলে, বোধ হয়, ডাকতেন) অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, একই রকমের চেহারা, বেশভূষা। হাতে বইয়ের অতিকায় চামড়ার ব্যাগ, মাথায় কালো টুপি। সমস্ত পরিবারটি কাছাকাছি কোনও ভালো হোটেলে খেতেন, বাড়ীতে রান্নাবান্নার বালাই ছিল না। পুস্তকের সংগ্রহ ছিল অজস্র, রাস্তার দিকে ক্ষুদ্র অধ্যয়ন-কক্ষটি, আধারে ও মেঝেতে রক্ষিত স্তূপীকৃত পুস্তকে সমাকীর্ণ। সেই কক্ষেই আমরা গুরুর সাক্ষাৎকার-লাভ ও পাঠগ্রহণ করতাম। সেই বৎসর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাপন্ন ফরাসী ভারতবিদ্যাবিৎ সিলভ্যাঁ লেভি Oriental Conference এর মূল সভাপতি হয়ে আসেন। সেবার ডাঃ তারাপুরওয়ালা তিনটি শাখার সভাপতিত্ব করেন।

কোনও কারণে নির্দিষ্ট বছরে আমার এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া স্থগিত রাখতে হয়েছিল। অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। যেবার পরীক্ষা দিলাম ডাঃ তারাপুরওয়ালা নিজে গুজরাতীর একটি পত্র পরীক্ষা করলেন, অপর পত্রটি বাইরে কোনও প্রখ্যাতনামা গুজরাতী সাহিত্যিক-পরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা করালেন। পাছে ছাত্রবাৎসল্য-জনিত পক্ষপাতের কথা ওঠে। 'ভারতীয় ভাষাসমূহ'-বিভাগে এমন একটা কথা অনেক সময় উঠত। আমার সঙ্গে একই বৎসরে পরীক্ষা দিলেন আমাদের প্রবীণ বন্ধু সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (পরে খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত)। সুধীরবাবু আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণ সুধী ব্যক্তি। আমাদের আগে এম. এ. ক্লাসে পড়ে তিনিও পরীক্ষা স্থগিত রেখেছিলেন। তাঁর অতিরিক্ত বিষয় ছিল ওড়িয়া ভাষা। দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠাপন্ন ছাত্র, সুলেখক। পরীক্ষার ফলাফল বিষয়ে আমরা উভয়ে

পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রত্যাশিত ফল সম্বন্ধে উভয়েই শঙ্কা ও উদ্বেগ নিয়ে প্রতীক্ষা করছি।

শোনা গেল, আটশোর মধ্যে ছ'শো ষোল নম্বর পেয়ে আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। সামান্য কিছু কম নম্বর পেয়ে সুধীর-বাবু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বন্ধুবর বিনায়ক সান্ন্যাল ও বন্ধুবর শ্যামাপদ চক্রবর্তীও আমাদের সঙ্গে সেবার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার ফল বিবেচনা করার জন্যে পরীক্ষক-সভা বসল দ্বারভাঙ্গা সৌধের দ্বিতীয় তলে প্রেসিডেণ্ট-অব-পোস্ট-গ্রাজুয়েট-কাউন্সিল-এর কক্ষে। আমি ও সুধীরবাবু শেষফলটি জানবার জন্যে অধীরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছি। মাঝে মাঝে দরজার খুব কাছে এসে কান পাতছি। পরীক্ষক-সভায় একটা কথা উঠেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যে মাত্র চারটি নম্বরের ব্যবধান। আটটি পত্র, দু'জনকেই ব্র্যাকেটে ফার্স্ট করে দিলে হয়। পূজনীয় অধ্যাপকদের কেউ প্রস্তাব করলেন, প্রস্তাব সমর্থিত হয়ে যায় যায়। এমন সময়ে অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা জানতে চাইলেন, "Who is leading in the larger number of papers ?" অধিক-সংখ্যক পত্রে কে উপরে রয়েছে। দেখা গেল, আটটি পত্রের মধ্যে ছ'টিতে আমি বেশি—দু'টিতে সুধীরবাবু বেশি নম্বর পেয়েছেন। বাংলার সব পত্রগুলিতেই আমি শীর্ষস্থানে রয়েছি। ডাঃ তারাপুরওয়ালা বললেন, "It will be unfair to equalise the difference. The first man has earned his position." "তফাৎটা তুলে দিয়ে এক-করে দেওয়া অন্যায় হবে। প্রথমোত্তীর্ণ তার স্থানটি ন্যায়তঃ অধিকার করেছে।" এর বিরুদ্ধে আর কেউ কিছু বললেন না। দুই বন্ধু খবরটি পেলাম। খাতা-হাতে বেরিয়ে যাবার সময় পরীক্ষানিয়ন্ত্রণ-বিভাগের প্রবীণ সহায়ক রমেশচন্দ্র সেন মহাশয় পাকা খবরটি দিয়ে গেলেন। নিরুৎসাহ সুহৃৎ সুধীরবাবুর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন সত্যই দুঃখবোধ করেছিলাম। তাঁর পরিণত বয়সের সুলিখিত 'কাব্যালোক' গ্রন্থের জন্যে তিনি যখন উত্তরকালে ডক্টর-অব-ফিলজফি উপাধি পেলেন তখন এই দিনকার ঘটনার কথা উল্লেখ করে কৌতুকভরে তাঁকে অভিনন্দন-লিপি পাঠিয়েছিলাম, চাটগাঁ কলেজ থেকে। চিঠির উত্তরে অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ও চিত্তের প্রসাদ বিতরণ করেছিলেন আমার অকালে-লোকান্তরিত বিদগ্ধ বন্ধুবর।

আজ কথাগুলি মনে পড়ছে অধ্যাপক তারাপুরওয়ালার প্রসঙ্গে। তাঁর

ছাত্রবাৎসল্যের জন্যেই এম. এ. পরীক্ষার ফলে আমার যে সামান্য বৈশিষ্ট্যটুকু রক্ষিত হয়েছিল জীবনসংগ্রামে তাতেই দাঁড়াতে পেরেছিলাম। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। আমরা কার্যব্যপদেশে দূরে চলে গেছি। উনিশ বছর পর কোলকাতায় ফিরে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা বিভাগ গড়বার কাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপনার কাজ নিয়ে বারো বছর কাটিয়ে ১৯৫৫ এ সরকারি চাকুরি হতে অবসর নিয়েছি। কর্মজীবনের হিসাব-নিকাশ, দেনাপাওনা চুকাতে গিয়ে পুরোনো ডাইরিতে নজর পড়ল। ১৯২৬ সালের একটি ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে যাবার সময় কোলকাতায় পঠদ্দশার কতকগুলি ঋণ পরিশোধ করে যেতে হয়েছিল। তখন হঠাৎ একসঙ্গে প্রায় দু'তিনশো টাকার দরকার হয়। কে ধার দেবেন? পাঁচ-ছ'টি সুবর্ণপদক ছিল। ব্যাঙ্কে বাঁধা দিয়ে দ্রব্যমূল্যের অনুপাতে ধার পাওয়া যায়, শুনলাম। কিন্তু একজন মান্যগণ্য মধ্যস্থ ব্যক্তির সুপারিশ না হ'লে ব্যাঙ্ক দিতে চান না। ধরলাম অধ্যাপক তারাপুরওয়ালাকে। ক্লাইভ স্ট্রীটের যে-ব্যাঙ্কে তাঁর নিজের টাকা-পয়সা থাকে সেখানেই চিঠি দিয়ে পাঠালেন। সমস্ত সুবর্ণপদকগুলি বন্ধক দিয়ে ধার পেলাম। কিছু কিছু সুদ ও অল্প কিস্তি মাঝে মাঝে ব্যাঙ্ককে দিয়ে চলেছি। অল্প মাইনে। শীঘ্রই সংসারী হয়ে পড়ি, টাকাটা সব শোধ হয়ে ওঠেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির অবসানে দু'বছর পরে সরকারি চাকরি নিয়ে চাটগাঁয় চলে যাই। এই সময়ে হঠাৎ শুনলাম, ডাঃ তারাপুরওয়ালা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে বোম্বে কোনও কলেজের অধ্যক্ষের পদ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হচ্ছেন সদ্যো-দেশপ্রত্যাগত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাপন্ন খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

হঠাৎ একটি ইনসিওর পার্সেলযোগে কোলকাতার ব্যাঙ্ক থেকে আমার সুবর্ণপদকগুলি ফিরে এল। ব্যাঙ্ক জানিয়েছেন ঋণের প্রস্তাবক এবং সুপারিশ-কারী অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা বাকি টাকাটা নিজ থেকে দিয়ে পদকগুলি আমার ঠিকানায় ফেরৎ পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমার ব্যক্তিগত ঋণ। তিনি অনুগ্রহ করে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর তো কোনও দায়িত্ব ছিল না। তথাপি বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে জীবন-সংগ্রাম-জর্জর বাঙালী ছাত্রের পদকগুলি উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়ে সব কাজ চুকিয়ে চলে

যাচ্ছেন। ডায়েরি-বইতে লেখা রয়েছে, ব্যাঙ্কের সেই ঋণের টাকার পঁয়ষট্টিটি টাকা শেষ পর্যন্ত বাকি রয়ে গিয়েছিল। সেই টাকা শোধ করে দিয়ে তিনি চলে গেছেন।

দিই-দিই করে সে পঁয়ষট্টিটি টাকা এতদিন দেওয়া হয়ে ওঠেনি। অনেকবার বন্ধুবর ডাঃ সুকুমার সেনের কাছ থেকে ডাঃ তারাপুরওয়ালার ঠিকানা নিয়েছি। কিন্তু ঋণশোধ করা হ'য়ে ওঠেনি। এবার আর দেরি করা নয়। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার ঠিক পূর্বে টাকা ক'টি মণিঅর্ডার যোগে বোম্বের ঠিকানায় পাঠিয়ে আচার্যদেবকে একখানি চিঠি লিখি। তাতে আমার এতদিনকার কর্ম জীবনের খবর দিয়ে তাঁর সংবাদ-জিজ্ঞাসু হয়ে অপরাধ-স্বীকার ও প্রণাম-কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তিনি মণিঅর্ডারটি গ্রহণ করে আবার স্বতন্ত্র মণি-অর্ডারযোগে সেইদিনই ফেরৎ পাঠালেন। সঙ্গে একখানি চিঠি দিয়েছেন তার মর্ম এই। অশীতিপর বৃদ্ধ হয়েছি। তোমার কোনও ঋণের কথা কিছুই মনে করতে পারছি-নে। অনেকদিন চ'লে গেছে। অস্পষ্টভাবে তোমার কথা মনে পড়ছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তুমি যে-সব ঘটনার উল্লেখ করেছ তারও কিছু কিছু মনে পড়ছে। কিন্তু তোমার ঋণের কথা কিছুতেই মনে পড়ছে না। এ অবস্থায় অর্থ গ্রহণ করি আমি কিরূপে? তাই তোমার প্রেরিত টাকা ক'টি ফেরত পাঠালাম। দুঃখ ক'রোনা যদি সত্যই সামান্য ঋণ তোমার অপরিশোধ্য থেকেই থাকে। আমি বলছি, এই ক'টি টাকা দেওয়ার আগেই তা শোধ হয়ে গেছে। এইমাত্র আমার ছেলে ও মেয়ে-জামাইদের কাছে বলছিলাম, আমার বাংলাদেশের এক সন্তান—তোমাদেরই মতো। দেখ, আমাকে স্মরণ করে কেমন চিঠি দিয়েছে! আমার দাদুরা আছেন, তোমার ছেলেরা! তাদের এই টাকা ক'টি দিয়ে কিছু বইপত্র ও ভালো খাবার কিনে দিও। ব'লো, তোমাদের শুভার্থী এক বৃদ্ধ দাদু আছেন বোম্বে-শহরে।

চিঠিখানি তাঁরই প্রদত্ত ও স্বহস্তলিখিত বহুকাল পূর্বের একখানি প্রশংসা পত্রের সঙ্গে সযত্নে রক্ষা করেছি। এমন গুরুর অপরিশোধ্য ঋণ আমি শোধ করতে চেয়েছিলাম? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে হয়ত কৃতঘ্নতার পরিচয় দিতে গিয়েছিলাম? সে পাতকের স্পর্শ হতে তিনিই আমাকে রক্ষা করলেন। চিঠি লেখার অল্পদিন পরেই অধ্যাপক ডাঃ তারাপুরওয়ালা ইহলোক ত্যাগ করেন। আমাকে তিনি অভয় দিয়ে গিয়েছিলেন, আমার ঋণ পরিশোধিত হয়েছে।

কিন্তু আমার প্রাণ বলে, তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। অপরপক্ষের তর্পণকালে যখন উচ্চারণ করি, "আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতমহাদয়ঃ," তখন সেই প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত উন্নতদেহধারী শ্রৌত-পণ্ডিতের অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যমূর্তিটি মানসনেত্রের সমক্ষে ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে।

কালা কিংবা গোরা

“জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি
সে জাতির নাম মানুষ জাতি”।
“না চিনিয়ে কালা কিংবা গোরা।”

কালা কিংবা গোরা

মেজর এফ. এস. সি. টম্‌সন

মেজর এফ. এস. সি. টম্‌সন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার কারাসমূহের অধিকর্তা, ইন্‌স্পেকটার-জেনারেল-অব-প্রিজন্‌স্। প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর পদ থেকে কারাবিভাগের এই সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন তিনি। উনিশশো সতেরো সালে দু'বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় আংশিকভাবে বর্গা হয়েছে। প্রশ্নপত্র বের হয়ে যাওয়ায় দু'দুবার পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে। জুলাই মাসে তৃতীয়বারের মতো পরীক্ষা দেওয়ার প্রতীক্ষা চলছে। এই সময়ে প্রেসিডেন্সি জেলের ডেপুটি জেইলর আমার জ্যেঠতুতো দাদা দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাসায় বেড়াতে যাই। একদিন প্রেসিডেন্সী জেল ও নিউ সেণ্ট্রাল জেল, এই দুই জেলের মাঝখানে বুড়িগঙ্গার ধারে ছায়ায়-ঢাকা নিভৃত বড়ো দুইটি কুঠিতে ফলকে-লেখা দুটি ইংরেজের নাম দেখলাম। একটি আলিপুরের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কোনও আই. সি. এস. সাহেব। অপরটি প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর এফ. এস. সি. টম্‌সন, আই. এম্. এস্.-এর। দ্বিতীয় নামটির বানান অনুযায়ী উচ্চারণ করতাম থম্‌প্‌সন্। দাদা একদিন হেসে শুধরে দিলেন থম্‌পসন্ নয় টম্‌সন্। সঙ্গে সঙ্গে বাৎলিয়ে দিলেন, থেম্‌স্ নদী নয় টেম্‌স্; থমাস্ নয় টমাস্, বেথুন নয়, বীটন্, ইত্যাদি।

জেলের ফটকে দাদার আফিসের গোড়ায় বিকালে দাঁড়িয়ে একদিন ঋজু দীর্ঘদেহ টম্‌সন্ সাহেবকে দেখলাম। তখন প্রেসিডেন্সী জেলে অনেক রাজবন্দী। যতদূর মনে পরে দাদার কাছে শুনতাম, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এ. সি. উকিলও রাজঅতিথিরূপে কিছুদিন আগে সেখানে এসেছিলেন। দাদা সরকারী কর্মচারী হ'লেও রাজবন্দীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সহাহভূতি ছিল। বিশেষ করে ডাঃ উকিল দৌলতপুর কলেজে থাকার সময় আমাদের খুলনা অঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। দাদা বলতেন, জেইলর সাহেব অপেক্ষা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব রাজবন্দীদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিপরায়ণ ছিলেন। একথা শুনে স্বভাবতঃ টম্‌সন্ সাহেবের প্রতি

অতর্কিতে মনটি শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়ে উঠেছিল। সাহেবের কুঠির সামনে দাঁড়িয়ে অনেক সময় তাঁর মহিমার বিষয় ভাবতাম। কখনও তাঁকে দেখতে পেলে মনে হ'ত, দর্শনের সুকৃতিসঞ্চয় হ'ল।

আমার দাদা জেল কর্মচারী হিসাবে কর্তব্যপরায়ণ হয়েও দেশানুরাগী ও রুচিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অশ্বিনীবাবু-জগদীশ-বাবুর আদর্শ-লালিত ছাত্র ছিলেন তিনি। টম্‌সন্ সাহেব সাধুতা ও কর্তব্য-নিষ্ঠার জন্যে অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে এঁকে সত্যই ভালবাসতেন। এই সময়ে অতিশ্রমের ফলে দাদা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোজ বিকালের দিকে তাঁর অল্প অল্প জ্বর হ'ত। তথাপি কঠিন শ্রমসাধ্য জেলখানার কাজ তিনি করে চলেছেন। দু'বেলা আফিস। রবিবারেও ছুটি নেই। কাজের ফাঁকে তিনি টেবিলে মাথা গুঁজে বিশ্রাম নেন। সাহেব ক'দিন যেতে-আসতে তাঁকে এইভাবে দেখলেন। একদিন এসে বললেন, "Deven Babu, you are ill. You must go on leave and arrange for rest and proper treatment." "দেবেনবাবু, তুমি অসুস্থ। ছুটি নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।" অল্প মাইনে, অনেক দায়। তাই ছুটি নেওয়ায় দেবেনবাবুর অনিচ্ছা। সাহেব একরকম জিদ ধরে জোর করে তাঁকে ছুটি নেওয়ালেন। এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমি ওখানে থাকতেই একদিন ঘটনাটি ঘটেছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাঝে মাঝে কর্মচারীদের বাসার চারিপাশে তদন্ত করে বেড়াতেন। একদিন আমাদের বাসার বাইরে থেকে শুনলেন জলের কল খুলে দিয়ে প্রচুর জল অপচয় করে স্নান বা বাসন মাজা হচ্ছে। সাহেব হুকুম দিয়ে দু'দিনের জন্যে কল বন্ধ রেখেছিলেন। এ আর এক মূর্তি! অন্যায় করলে খাতির কাউকে করতেন না তিনি।

যেদিন দীর্ঘকালের ছুটি নিয়ে দাদা আফিস থেকে বেরিয়ে আসেন, দেখে-ছিলাম, সাহেব ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে হাত রেখে অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাঁর অচির রোগমুক্তি ও সুস্থ দেহে চাকুরিতে প্রত্যাবর্তন কামনা করেন। সাহেব আশ্বাস দিয়েছিলেন, ছুটিতে থাকার দরুণ তাঁর আসন্ন পদোন্নতির সম্ভাবনা ব্যাহত হ'তে দেবেন না তিনি। দাদাকে নিয়ে আমরা দেশে এলাম। আমাদের বৈদ্যপ্রধান সেনহাটি-গ্রামে

বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা ছিলেন। চারজন কবিরাজ বৈঠক করে একযোগে তাঁর রোগনির্ণয় করে ব্যবস্থা দিলেন। বললেন বিষম জ্বর, নানাপ্রকার সাদা-কালো-লাল বটিকা ও চূর্ণ দিলেন। রোগের উপশম হ'ল না। উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। কোলকাতায় আনা হ'ল। প্রথমে কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় দেখলেন। অবস্থা শুনে দর্শনী গ্রহণ করেননি কোলকাতার শ্রেষ্ঠ কবিরাজ বাচস্পতি মহাশয়। তিনিও সন্তত-বিষমজ্বরের চিকিৎসা করলেন। দুঃখের বিষয়, চিকিৎসা ফলোপধায়ক হলনা। তখন ডাঃ পি. নন্দী এবং তাঁরই প্রস্তাবে মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ক্যালভার্ট এলেন। ক্ষয়রোগ বলে মত দিলেন। রোগীর চিকিৎসা সেইভাবে আরম্ভ হ'ল। বায়ুপরিবর্তনের জন্য তাঁকে পুরী নিয়ে যাওয়া হ'ল। সমুদ্রোপকণ্ঠে স্বর্গদ্বারে পাঁচমাস রোগভোগের পর একটি সুশিক্ষিত প্রকৃতিবিরুদ্ধ-বৃত্তিধারী মহাপ্রাণ যুবকের জীবনাবসান হ'ল।

প্রবেশিকা পর্যন্ত আমার শিক্ষার ব্যয়ভার তিনিই বহন করেছিলেন। প্রবেশিকায় সরকারি বৃত্তি পেলেও তাঁর অভাবে ছাত্রজীবনে আমি অসহায় হয়ে পড়লাম। বিজ্ঞ নিকট আত্মীয়স্বজন পরামর্শ দিলেন, আমার বাবা বৃদ্ধ ও বৃহৎ পরিবার-প্রতিপালনের দায়ে অভাবক্লিষ্ট। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আমার খুলনার আদালতে কাজকর্মের চেষ্টা দেখা উচিত। অথবা দাদার দোহাই দিয়ে জেলখানার চাকরির জন্য সাহেবদের সঙ্গে দেখা করলে চাকরি জুটতে পারে। উপদেশটি অনেকেরই ভালো লাগল। প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টমসন্ সাহেবের কথা আমার মনে পড়ল। আরও মনে হ'ল তিনি ছিলেন স্বর্গত দাদার গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী উপরওয়ালা। কোলকাতায় চলে এলাম। একদিন আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। জেলের ফটকে গিয়ে শুনলাম, টমসন্ সাহেব সেখানে নেই। তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। তিনি কারাবিভাগের অধিকর্তা হয়ে চলে গিয়েছেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এ তাঁর আফিস।

গেঁয়ো বোখা ছেলে ছিলাম। লালদীঘিতে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ইনস্পেক্টার জেনারেল অব প্রিজনস্-এর ঘরের সামনে হাজির হয়ে দর্শনার্থীরূপে চিরকুট পাঠালাম। অনির্দিষ্ট ভয়ে বুক কাঁপছিল। সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অভিজ্ঞতা নেই। মনে মনে মোহড়া দিতে লাগলাম। ইংরেজি বাক্যগুলি

সাবধানে বাগিয়ে নিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই ডাক পড়ল। নমস্কার করে পরিচয় দিলাম। দাদার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে তাঁর প্রতি সাহেবের স্নেহানুগ্রহের কথা স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা জানালাম। সেই সঙ্গে আমাদের পরিবারের আকস্মিক অসহায় অবস্থার কথাও জানালাম।

সাহেব সত্যই দুঃখানুভব করলেন। মনে হ'ল, সহানুভূতিতে তিনি কতকটা বিচলিত হয়েছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "What can I do for you?" "তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?" আমি বললাম, দাদা তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলে রেখে গিয়েছেন। তাদের প্রতিপালন ও বড়ো মেয়েটির আশু বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর পড়েছে। আমার বাবা বৃদ্ধ। তাঁর ভূ-সম্পত্তির আয় সামান্য। বহু পোষ্য-পরিজন। আমাকে একটি চাকরি দিতে হবে। আমি লেখাপড়া কতদূর করেছি জিজ্ঞাসা করলেন সাহেব। প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি বৃত্তিলাভ করেছি, আমি বললাম। সাহেব শুনে বললেন, "বটে, চাকরি তোমাকে হয়ত দিতে পারি। সহকারী-জেইলরের পদের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা তুমি অর্জন করেছ। কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ তুমি। তুমি ভালো ছেলে। তোমার ভবিষ্যৎ আছে। এখনই চাকরি নিওনা। বৃত্তির টাকায় কষ্টে-সৃষ্টে পড়াশুনা করে এগিয়ে যাও। গ্রাজুয়েট হয়ে উপার্জনক্ষমতা লাভ করে শীঘ্রই বাবার পাশে দাঁড়াতে পারবে। এর মধ্যে খুব অভাবে পড়লে আমার কাছে আসবে।"

আমার নিকট আত্মীয়েরা দিয়েছিলেন চাকরির পরামর্শ। কিন্তু এই নিঃসম্পর্কিত উচ্চপদস্থ ইংরেজ পরামর্শ দিলেন, পড়াশুনা করে এগিয়ে যেতে। মহাপ্রাণ বৈদেশিকের কাছে সাহায্য চাইতে আমাকে আর যেতে হয়নি এর পরে। কিন্তু তাঁর সদুপদেশ শুভানুধ্যায়ীর আশীর্বাদ হয়ে কাজ করেছিল আমার জীবনে। আমার জীবনদেবতা কাজ করেছিলেন মেজর-সাহেবের সহৃদয়তা, মানবহিতৈষণা ও দূরদৃষ্টিকে আশ্রয় করে।

অধ্যাপক ডাঃ হেনরি স্টিফেন

শুনেছি, এক সময়ে ডাফ্ কলেজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন অধ্যাপক হেনরি স্টিফেন। তাঁর রচিত সুবৃহৎ মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ ANALYTICAL PSYCHOLOGY দুইখণ্ড এবং দর্শন বিষয়ক PROBLEMS OF METAPHYSICS আমরা বি.এ. পড়বার সময় দর্শনশাস্ত্রের পাঠ্যরূপে পড়েছিলাম। ইদানীং তিনি হয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক-প্রধান। পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে এমন বহুমুখিতা বেশি দেখা যায় না। মনে আছে, আমাদের এম. এ. পড়বার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বাংলার লাট লর্ড লিটন স্যার আশুতোষের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। আমরা স্নাতকোত্তর ছাত্রেরা দ্বারভাঙ্গা সৌধের দ্বিতীয় তলে গ্রন্থাগারে সারি দিয়ে পড়াশুনো করবার জন্যে বসে গিয়েছিলাম। বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বাইরে সিড়ির ধারে স্যার আশুতোষের আবক্ষ মর্মর-মূর্তির পার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ চ্যান্সেলারের অভ্যর্থনার জন্যে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। চ্যান্সেলার এলেই স্যার আশুতোষ একে একে সমস্ত অধ্যাপককে পরিচায়িত করে দিলেন তাঁর কাছে। প্রথমেই পরিচায়িত করলেন অধ্যাপক স্টিফেনকে। পরিচয় প্রদানের ভাষাটি আজও মনে আছে। "This is Dr. Henry Stephen, the grand old man of this University, a teacher of three generations of students." "ইনি ডাঃ হেনরি স্টিফেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমানাস্পদ সুপ্রবীণ অধ্যাপক, ছাত্রদের তিন পুরুষের শিক্ষক।"

অধ্যাপক স্টিফেন শেষের দিকে দৃষ্টিশক্তি অনেকটা হারিয়ে ফেলেছিলেন। চশমার ওপরেও বড়ো কাঁচ লাগিয়ে পড়াশুনা করতেন। এই রকম একখানি বড়ো কাঁচ কালো কার দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। সেই কাঁচ চোখের কাছে ধরে বই ও খাতার লেখা পড়তেন, মৃদু পদচারণা করে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে পড়াতেন। অগাধ পাণ্ডিত্য ছাড়া তার মনুষ্যত্বের নানা দিক এ-দেশের মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। আজীবন তিনি কৌমার্যব্রতধারী ছিলেন। সরল জীবনযাপন ও উচ্চচিন্তা তাঁর চরিত্রে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক সময়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুণ অর্থাভাব চলছিল। সরকারের সঙ্গেও চলছিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যার আশুতোষের মনকষাকষি। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা, অপরদিকে অমর্যাদাকর ও আত্মকর্তৃত্ব-বিলোপী সর্তে সরকারী অর্থ সাহায্য গ্রহণ। এই দুইয়ের মধ্যে পুরুষসিংহ আশুতোষ প্রথমটি ও তৎসঙ্গে অর্থকৃচ্ছ্রতা বরণ করে নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা দীর্ঘকাল বেতন পাননি। পরীক্ষকেরা পরীক্ষার কার্যের জন্য পারিশ্রমিক পাননি। তথাপি তাঁরা সে-যুগে স্যার আশুতোষের নীতিকে মনে-প্রাণে সমর্থন করে গর্ব অনুভব করতেন। ইংরেজ অধ্যাপক ডাঃ স্টিফেন নৈতিক ও আত্মিক ভাবে ছিলেন আশুতোষের একজন গুণগ্রাহী সমর্থক। শুধু তাই নয়। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাবের জন্য দরিদ্র ছাত্রদের ফ্রি-স্টুডেণ্টসিপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন ডাঃ স্টিফেন তাঁর বেতনের বহুলাংশ গ্রহণ না করে সেই টাকায় ফ্রি-স্টুডেণ্টসিপ বজায় রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে দুটি দিনের জন্য ছাত্ররূপে এই দেবোপম অধ্যাপকের পাদমূলে বসবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সে সম্পর্ক অচিরাৎ ছিন্ন হয় আমি পাঠ্যবিষয় পরিবর্তন করে বাংলার এম. এ. ক্লাসে যোগ দেওয়ার জন্যে। কিন্তু তার আগে যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে এই সদ্‌গুরু-সঙ্গের সুকৃতিলাভ করেছিলাম সেটি এখানে উল্লেখ করব. সংস্কৃতে অনার্স পড়েও বি. এ. পরীক্ষা দিতে হয়েছিল অনার্স ছাড়া। সে এক দীর্ঘ বিষাদময় কাহিনী, এখানে অবতারণা করবার প্রয়োজন নেই। ইংরেজি ও সংস্কৃত তুল্যরূপ মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলাম। এম. এ. পড়ব এই দুয়ের মধ্যে কোন্ বিষয়ে, সে সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংশয় ছিল। কেই বা সদুপদেশ দেবেন? ঠিক করলাম বি. এ. পরীক্ষার নম্বর দেখে এম. এ.-র বিষয় নির্বাচন করব। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বে কি করে নম্বর জানা যায়? এই কৌতূহল ও অধ্যবসায় অন্যায় ও অবৈধ হলেও ছাত্র সমাজের এবং অভিভাবকদিগের চিরন্তন দুর্বলতা এটি। উনিশশো একুশ সাল। শুনলাম, সেবার বি-এ পরীক্ষার ইংরেজির তিন পত্রেরই পরীক্ষক সংঘের অধিনায়ক (Chairman of the Board of Examiners) অধ্যাপক ডাঃ হেনরি স্টিফেন।

খবর নিয়ে জানলাম, ডাঃ স্টিফেন থাকেন লাটভবনের কাছে স্পেন্সিস্ হোটেলে। হাজির হ'লাম এক সকালে স্পেন্সিস্ হোটেলে। সেখানকার হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ বলল, সাহেবের কাছে চিরকুট পাঠাতে হয় না। দেখা করবার

অবাধ অধিকার সকলের সব সময়। দুঃসাহসে ভর করে প্রবিষ্ট হলাম সাহেবের কক্ষে। এর আগে চাক্ষুষ দেখা হয়নি তাঁকে। বয়স তাঁর তখন ষাটের অনেক ওপর। চিরকুমার সারস্বত-ব্রতধারী বৃদ্ধ সৌম্য অধ্যাপক। প্রশস্ত কক্ষে চেয়ারে বসে সামনে একখানি ছোট টেবিলে কাগজপত্র দেখছেন। চারিপাশে খোলা পুস্তকাধারে অনেক বই। রাশি রাশি বই, কতক পুস্তকাধারে, কতক বা কেরোসিন কাঠের বাক্সে কতক ইতস্ততঃ ছড়ানো। মাঝে মাঝে পরীক্ষার খাতার স্তূপ। সব কিছু এলোমেলো স্তূপাকারে রয়েছে, খুব সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো-গোছানো নয়। একটি মাত্র এই-দেশী ভৃত্য, পাশে ঘোরাফেরা করছে। আমার ঢোকার সঙ্গে মুখ তুলে তাকিয়ে অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন, "What do you want?" "কি চাও তুমি?"

প্রাতঃপ্রণাম জানিয়ে আমৃতা আমৃতা করে অসঙ্গত প্রয়োজনটি ব্যক্ত করলাম। উত্তর হ'ল, "Marks are confidential." "পরীক্ষার নম্বর গোপনীয় ব্যাপার।" দুঃসাহস করে বললাম, "তা তো জানি স্যার, তবু এসেছি, অপরাধ নেবেন না। এম. এ, পড়বার বিষয় নির্বাচনের জন্য আমার ইংরেজির নম্বর জানার দরকার। সাহেব আর কিছু না বলে রোল নম্বরটা জেনে নিয়ে উঠে গেলেন এবং কাগজপত্র ঘেটে ফিরে এসে বললেন, "You have passed"—"পাশ করেছ তুমি!" আমি বললাম, "I was confident of a pass. I want to know the marks." "পাশ আমি করব, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় ছিলাম। আমি নম্বর জানতে চাই।" একটু হেসে সাহেব বললেন, "You are a naughty boy, I see. You have got good marks." "দুষ্টু ছেলে তুমি। ভালো নম্বর পেয়েছ।" আমি বললাম, "I was confident of that too. Will you kindly give me an idea of the exact marks?" "তাও আমি জানতাম। আপনি দয়া করে ঠিক কত নম্বর পেয়েছি সে-সম্বন্ধে আমাকে আভাস দেবেন কি? সংস্কৃতে আমি ভালো নম্বর পেয়েছি। ইংরেজিতেও যদি উচ্চ নম্বর পাই তবে ইংরেজিতেই এম. এ. পড়ব ভেবেছি।" সংস্কৃতে কত নম্বর পেয়েছি জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তিনশো' এর মধ্যে দু'শো পঞ্চাশ। বললেন, "খুব ভালো নম্বর পেয়েছ তো। ইংরেজিতেও উচ্চ নম্বর আছে তোমার, তবে তোমার সংস্কৃতের নম্বরের মত অত বেশি নম্বর ইংরেজিতে তো আশা করতে পার না।"

অতঃপর দয়া করে আমাকে যথার্থ নম্বরটি তিনি বলে দিলেন, তিনশো'র মধ্যে পূরো দুই শো।

এর পরে জানতে চাইলেন, "এবার তোমার এম. এ. পড়বার জন্যে নির্বাচিত বিষয় কি হবে?" আমি বললাম, ইংরেজিতে এম. এ. পড়ব।" সাহেব খুশী হয়ে বললেন, "বেশ পরে দেখা হবে।" "ইংরেজির এম. এ. ক্লাসে ভর্তিও হয়েছিলাম। তাঁর ক্লাসে প্রথম দিকেই আমার রোল নম্বর ছিল, রোলনম্বরটি ডেকে মুখ তুলে চেয়েছিলেন, আপাদমস্তক দেখলেন। প্রসন্নভাবে মৃদু হেসে বললেন, "I see, you are here. I am glad." "তুমি এসেছ দেখছি। খুশী হলাম।" কি গভীর সে চিত্তের প্রসাদ, কি দিব্য দীপ্ত সে হাসি!

আর্থার ম্যাকডোনাল্ড্

উনিশশো আঠাশের এপ্রিল মাসে গ্রীষ্মাবকাশের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বঙ্গবিভাগের দু'বছরের চাকরির অবসান হ'ল, প্রত্যাশা ও মৌখিক প্রতিশ্রুতিভঙ্গের বেদনার মধ্য দিয়ে। রীতিমতো নির্বাচিত হয়ে ঢুকেছিলাম। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে আছালৎ হওয়া ঘটল না। সে অনেক কথা, জীবনের এই পর্বে বলবার কথা নয়। বিদেশী উপাচার্য জি এইচ ল্যাংলি বিদায় মুহূর্তে সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, নানা কারণপরম্পরার একত্র সমাবেশ ঘটায় তোমাকে পুনর্নিয়োগ করা গেল না। অন্যভাবে আমি যদি তোমার কোনও কাজে লাগতে পারি, সুখী হব। আমার দু'বছরের কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে তিনি একখানি জোরালো প্রশংসাপত্রও দিলেন। দু'তিন জায়গায় আমার জন্যে সুপারিশ-পত্রও দিয়েছিলেন। কিন্তু সে-সমস্ত জায়গায় আমার চাকরি হয়নি। তবে বৈদেশিক উপাচার্যের গুণগ্রাহিতা ও সহানুভূতিটুকু ছিল অকৃত্রিম।

সমস্ত গ্রীষ্মাবকাশে চাকরি খোঁজাখুজি চলল। এম.এ. পরীক্ষায় কৃতিত্ব, তদানীন্তন আচার্যবৃন্দের জোরালো অকুণ্ঠ প্রশংসাপত্র, গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা, এই তিনটি দাবির একত্র সমাবেশেও অধ্যাপনার কায়েমি সামান্য উপাধ্যায়ের একটি পদ জুটতে দস্তুরমতো নাজেহাল হয়ে পড়ি। তখন

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপকের মুষ্টিমেয় ক'টিমাত্র পদ। ঢাকায় অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন, মোহিতলাল মজুমদার উচ্চতর বেতনে আমার স্থলে গেলেন। কলিকাতায় আমারই পূজনীয় অধ্যাপকেরা চারিজন চারিটিমাত্র পদে আছেন। স্বর্গত বন্ধু মণীন্দ্রমোহন বসু ও বন্ধুবর তমোনাশ দাশগুপ্ত তখন অধ্যাপক নন, গবেষণা-সহায়ক ছিলেন। স্বর্গত শশাঙ্কমোহন সেনের আকস্মিক মৃত্যু ও বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায়ের অবসর-গ্রহণে শূন্য ছুটি অধ্যাপকের পদে এঁরা দুজন প্রার্থী হলেন, সেইসঙ্গে আমি, সতীর্থ সুহৃদ্বর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ও স্বর্গত শ্রদ্ধেয় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সর্বসমেত এই পাঁচজন প্রার্থী হলাম। গবেষণা-সহায়ক মণীন্দ্রবাবু ও তমোনাশবাবু, দুজনই ছুটি পদে নিযুক্ত হ'লেন। আমরা কেউ হ'লাম না। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার সুযোগও হারালাম। কোথায় চাকরী পাই ?

তখন বাংলা দেশের কলেজসমূহে বাংলা পড়ানোর জন্য স্বতন্ত্র পদের সৃষ্টি হয়নি। মুখ্যতঃ সংস্কৃতের অধ্যাপকেরাই বাংলা পড়াতেন অথবা বাংলা রচনাদির শিক্ষা দিতেন। একটু সাহিত্যিক মতিগতি যাঁদের ছিল এমন অন্য-বিষয়ের অধ্যাপকেরা এমন কি গণিতের অধ্যাপকও ইচ্ছাপ্রকাশ করলেই বাংলা পড়াবার ভার পেতেন। এই সময়ে একটা জনশ্রুতি শোনা গেল, সদ্যো-লোকান্তরিত স্যার আশুতোষ বাংলায় এম.এ. প্রবর্তন ও বাংলাবিভাগের সৃষ্টি করেই নিরস্ত থাকেন নি। সরকারি এবং বে-সরকারি কলেজসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ একটি করে বাংলার অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করবার জন্যে তিনি কিছুদিন থেকে জোর তাগিদ দিচ্ছিলেন। সারস্বত-ব্রতীর চিরসুহৃদ্, অগতির গতির প্রসাদে আমাদের একটা গতি হবার উপক্রম হয়ে আসছিল। উনিশশো আঠাশে সর্বপ্রথম ছ'টি সরকারী কলেজে ছ'জন বাংলার উপাধ্যায় (LECTURER) নিযুক্ত হবে, এ-খবর দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ল্যাংলি সাহেব। তিনি আমাকে সরকারি শিক্ষাধিকরণে খোঁজখবর নিতে বলে দিয়েছিলেন।

তখন সবে সংসারী হয়েছি। আকস্মিকভাবে ঢাকার চাকুরির অবসান হওয়ায় সংসারনির্বাহের দায়িত্বক্লিষ্ট ও চাকুরির জন্যে খুব উতলা হয়ে উঠেছিলাম। তদানীন্তন শিক্ষানিয়ামক স্টেপল্টন্ সাহেবের সঙ্গে রাইটাস বিল্ডিং-এ দেখা করলে তিনি বললেন, "হাঁ, বাংলার পদসৃষ্টির কথা হয়েছে বটে। তবে শিক্ষা transferred subject, আগামী বাজেটে টাকা মঞ্জুর হ'লে তখন বাংলার অধ্যাপকের

পদ হবে। বাংলায় Lecturer বা উপাধ্যায়ের পদ হবে, Professor-এর পদ নয়। এই নিয়োগ সম্বন্ধে ভার থাকবে সহকারী শিক্ষা-নিয়ামক মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের উপর। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পার। শিবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজের প্রাক্তন গণিতাধ্যাপক ও অধ্যক্ষ স্কচ্‌ম্যান আর্থার ম্যাকডোনাল্ড। পাশের ঘরে চিরকুট পাঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। কথাবার্তায় মনে হ'ল সাহেব রুক্ষ মেজাজের। আমার যোগ্যতা ও বিশেষ দাবি কি, জিজ্ঞাসা করায় বললাম, বাংলার এম. এ-দের মধ্যে আমি শুধু আমার বছর প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করেছি তা নয়, গবেষণার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা শুধু আমারই আছে। আমার আচার্যবৃন্দ ও পূর্বতন উপরওয়ালারা আমার কাজ-কর্মের সম্বন্ধে লিখিতভাবে যা বলেছেন আমার বিশেষ দাবি তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সাহেব প্রশংসাপত্রগুলি দেখে একটু নোট রেখে সেদিনের মতো আমাকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে বলে দিলেন, "এখানে আর আসবে না, সম্ভাবনাক্ষেত্রে খবর পাবে।"

কিছু'দিন ধরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কোলকাতায় মফস্বলে নানা কলেজে চাকুরির তল্লাসে ঘুরে ক্লান্ত ও নিরাশ হয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছি। বাবা তখন অসুস্থ, আমার প্রথম কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সুবর্ণপদকগুলি একাধিক-বার বন্ধক দিয়ে ঢাকার এক অধ্যাপক-সহকর্মীর নিকট থেকে টাকা ধার করে সাংসারিক কর্তব্যপালন করে চলেছি। হঠাৎ বাড়ীতে সেনহাটির ঠিকানায় চিঠি এল—ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের স্বাক্ষরিত টাইপ-করা চিঠি। ছ'টি সরকারি কলেজে ছ'টি উপাধ্যায়ের পদ সৃষ্ট ও বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আমি যদি পূর্বেই দরখাস্ত না করে থাকি, অবিলম্বে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যেন এই ছ'টি কলেজে দরখাস্ত করি,—কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ, বেথুন কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, রাজশাহী কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। সর্বশেষোক্ত কলেজে কিন্তু পরে গোটা পদের বদলে আধখানি পদের সৃষ্টি করে ব্যয়সঙ্কোচ করা হয়। হুগলী কলেজেও তাই।

বলা বাহুল্য, সেইদিনই খুলনা শহরে গিয়ে টাইপ করিয়ে ছ'খানি দরখাস্ত রেজিস্টারি ডাকে যথাসময়ে ছ'টি কলেজে পাঠানো গেল। লোভ ও আশা ছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজের উপাধ্যায়ের পদটি আমি পেতে পারি। ঢাকার উপাচার্য

স্ট্যাংলি সাহেব তদানীন্তন অধ্যক্ষ রামস্‌বটম্‌কে আমার জন্যে লিখেছিলেন। আমার শাক্কাদ্‌-গুরু ডাঃ তারাপুরওয়ালা প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক স্যার জাহাঙ্গীর কয়াজিকে আমার পক্ষে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে আমি নির্বাচিত হলাম না। কে নাকি রটিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ভালো পড়াতে পারিনে, শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলে কি হবে? কৃষ্ণনগর ও রাজশাহী কলেজের স্থানীয় কর্তৃপক্ষও নির্বাচিতদের মধ্যে আমার নাম পাঠাননি। বেথুন কলেজে একজন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন। শেষে অবশ্য তিনি এপদ গ্রহণ করেননি। চাটগাঁ কলেজের কথা কোনদিন ভাবিনি, আশা করিনি। অন্য সব কলেজের নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচিত প্রার্থীরা জেনে গিয়েছেন। নিরাশ হয়ে বাড়ী থেকে সহকারী শিক্ষানিয়ামককে চিঠি দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে 'হায় হায়' করে অস্থির হয়ে কোলকাতায় এসে পড়লাম। রাইটার্স বিল্ডিং-এ ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করতেই সাহেব অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "You are giving this office a lot of trouble"—"বড় জ্বালাচ্ছ তুমি এই অফিসকে।" বিনীতভাবে বললাম, "আমি বড় বিপন্ন। আপনি আমার জন্যে কিছু করুন।" তিনি তেমনি রুক্ষভাবে বললেন, "Why, why should I do something especially for you?"—"কেন, তোমার জন্যে বিশেষ কিছু আমি করতে যাব কেন?" কথাটি শুনে আমার নৈরাশ্যের মধ্যেও একটু জিদ চেপে গেল। আমিও একটু উত্তেজিত-ভাবে বললাম, "যাঁরা আমার পরে পাশ করেছেন অথবা আমার সঙ্গেই আমার মতো ভালো করে পাশ করেননি অথবা যাঁরা আমার মতো গবেষণা ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেননি তাঁরা সব স্থানীয় গভর্নিং বডিতে প্রভাব প্রতিপত্তির বলে নির্বাচিত হয়ে গেলেন বিভিন্ন কলেজে। আমার জন্যে কোথাও বলবার তো কেউ নেই। তাই বলে আমি কোথাও কাজকর্ম পাব না?" আমার উত্তেজনায় সাহেবের সুর নেমে এল। তিনি বললেন, "কি করব, কলেজের গভর্ণিং বডিতেই উপাধ্যায় (Lecturer) পদের নির্বাচন বা মনোনয়ন হয়, মনোনীত একাধিক ব্যক্তি থাকলে আমরা তার মধ্যে যে-কোনও একজনকে নিয়োগ করতে পারি। তোমার নাম তো এ-পর্যন্ত কোনও কলেজের গভর্নিং বডি পাঠাননি। প্রেসিডেন্সি, বেথুন, রাজশাহী, কৃষ্ণনগর এই সব কলেজ এক একটিমাত্র নাম পাঠিয়েছেন। মফস্বলে কৃষ্ণনগর কাছে, তুমি কৃষ্ণনগর

কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে পার, তোমার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নাম কেন তাঁরা পাঠাননি।

ছুটলাম কৃষ্ণনগরে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিকট আত্মীয় রায় বাহাদুর ইন্দুভূষণ ভাদুড়ীর বাড়ী লক্ষ্য করে জীবনে প্রথম কৃষ্ণনগরে সন্ধ্যাবেলায় হাজির হয়ে দেখি, পরিবারে তখনই একটি মৃত্যু-সংঘটন হয়েছে, অন্তঃপুরে ক্রন্দনরোল উঠেছে। তাই সেখানে ওঠা হ'ল না। পাশের এক অপরিচিত সহৃদয় মোক্তারের বাড়ীতে রাত কাটালাম। তিনি কায়স্থ ও প্রাচীনপন্থী বলে ব্রাহ্মণ অতিথির অন্ন আহারের পরিবর্তে দধিযোগে চিপিটকের ব্যবস্থা করলেন।

পরদিন সকালে অধ্যক্ষ সামসুল-উলেমা কামালুদ্দীন আহাম্মদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমার পরিচয় জেনে টেনে টেনে ইংরাজীতে বললেন, "তুমি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, তোমার উচ্চারণ বিকৃত হবে। কৃষ্ণনগরের উচ্চারণ বাংলার আদর্শ উচ্চারণ। তুমি বাংলার ক্লাস সামলাতে পারবে না।" আমি বললাম, "আমি ঠিক পূর্ববঙ্গের নই, প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা-সেনহাটির লোক, আমার বাংলা উচ্চারণ বিকৃত এ খবর এতদিন কেউ তো আমায় দেননি। আমি সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে থাকি, শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকেন, তারিফও করেন বলে মনে হয়। বিশেষ করে, আপনি তো আমাকে বাংলা বলতে শোনেননি।" তখন তিনি বিরক্ত হয়ে অন্য কারণ দেখালেন, যা যুক্তি নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপার। বললেন কলেজের গভর্ণিং বডি যা করেছেন, তা আর পুনর্বিবেচনা করবার কিছু নেই। গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য ব্যবহারাজীব খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক (পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী স্যার আজিজুল হক) ও পরিচালক-সমিতির সভাপতি জিলা জজ ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গেও দেখা করলাম। তাঁরা আমার যোগ্যতাদির কথা শুনে বলে দিলেন, "We wish you luck elsewhere."

হন্ত-দন্ত হয়ে পড়লাম এসে আবার রাইটার্স বিল্ডিং-এ ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের কক্ষের সামনে। সব বৃত্তান্ত বলে নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানালাম এই বলে, "Our chances are few and far between". বহুদিন পরে বাংলার অধ্যাপক পদে নিয়োগের এই প্রথম সুযোগ এসেছে। শীঘ্র আর আসবে না। সাহেব এবার ধমক তো দিলেন না, বরং ভাবিত

হয়ে বললেন, "তাইতো, তোমার জন্তে তো মুস্কিলে পড়া গেল। আচ্ছা আজ তুমি এস। দেখি, ডি. পি. আই.-এর সঙ্গে পরামর্শ করে—চাটগাঁ কলেজের নমিনেশন এখনও আসেনি। এক সপ্তাহ পরে তুমি একবার দেখা করবে। সপ্তাহ কাটতেই হাজির হলাম। সাহেব বললেন, "তোমাকে যদি চাটগাঁয় পাঠানো যায় তুমি যাবে কি?" আমি বললাম, "পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় আমাকে পাঠান, আমি ভালো মনে সাধ্যমতো নিষ্ঠা দিয়ে কাজ করব।" সাহেব বললেন, "All right, you have got the Chittagong appointment"—প্রায় হাসিকান্নার মধ্য দিয়ে সাহেবের নিকট আবেগভরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। সাহেব শুধু হেসে বললেন, "নিয়োগপত্র তোমার বাড়ীর ঠিকানায় যাবে। এবার বাড়ী চলে গিয়ে প্রতীক্ষা কর।"

আসল ব্যাপারটি পরে জানা গেল। যেখানে আমার কোনও প্রত্যাশা বা প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না সেখানকার গভর্ণিং বডির সদস্তরা আমার আবেদনপত্রে বর্ণিত পরিচয় বিচার করে মনোনীত তিনজন প্রার্থীর মধ্যে তৃতীয় নাম হিসাবে আমার নামটি শিক্ষাদপ্তরে পাঠিয়েছিলেন। শিক্ষাধিকরণ আমাকেই নিয়োগ করে হুকুম পাঠালে একটা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল চট্টগ্রামে। প্রথম-নির্বাচিত স্থানীয়-প্রার্থীকে না দিয়ে কেন তৃতীয় নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে জানতে চাইলেন গভর্নিং বডির সভাপতি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ম্যাকালফিন। সংক্ষিপ্ত জবাবে ডি. পি. আই. জানালেন, তিনজনকে "নির্বাচন তোমরা করেছ, নিয়োগের ভার তো তোমাদের নয়, আমাদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। আমরা যোগ্যতম প্রার্থীকেই নিযুক্ত করেছি।" চাকুরি আমিই পেলাম, অপরের আশাভঙ্গ হ'ল—একথা ভাবতে আজ মন সত্যই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সরকারি চাকুরি আমি আদৌ পেতাম না, পদস্থ ঊর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মচারী অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড যদি ন্যায়পরায়ণ না হতেন।

রিচার্ড বেরি র‍্যাম্‌স্‌বটম্‌

অধ্যাপক র‍্যাম্‌স্‌বটমের নাম শুনতাম পঠদ্দশায়—পুরোনো ঢাকা কলেজের ইতিহাসের তেজস্বী আই. ই. এস. ইংরেজ অধ্যাপক। খ্যাতনামা অধ্যাপক

অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন এঁর সহযোগী। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী-প্রমুখ যশস্বী ইতিহাসের অধ্যাপক এঁদের দু'জনের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হ'লে ইনি হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে চলে যান। তখন ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগেও ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের পদেও তিনি কিছুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাড্‌লার কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ইনি অদ্ভুত সত্যসন্ধতা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়ে নাকি বলেছিলেন, ভারতীয় কলেজে ইউরোপীয় অধ্যক্ষ একটি বে-মানান ব্যাপার ("A European Principal in an Indian College is a misfit")। এঁর মতে, ভারতীয় ছাত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে ইউরোপীয় অধ্যক্ষের সহানুভূতির পূর্ণ যোগ থাকতে পারে না। এতে ইংরেজ সরকার এবং ইংরেজ আই. সি. এস. মহল এঁর পরে খুব চটে গিয়েছিলেন। এঁকে অনেকদিন তাঁরা প্রায় একঘরে করে রেখেছিলেন। অধ্যাপনায় প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং পদমর্যাদায় প্রবীণ হয়েও তিনি ডি. পি. আই. পদে উন্নীত হতে পারেননি। ভারতীয় ঐতিহাসিক কমিশনের ইনি একজন প্রবীণ সদস্য ছিলেন।

উনিশ-শো-উনত্রিশ সাল। চাটগাঁ কলেজে বাংলার নব-সৃষ্ট অধ্যাপক পদে প্রথম-নিযুক্ত অধ্যাপক হয়ে এক বছর কাটিয়েছি অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডুর আমলে। গ্রীষ্মাবকাশের পর পূর্ণবাবুর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ এবং অধ্যক্ষের পদে স্থায়িভাবে র‍্যাম্‌স্‌বটম সাহেবের নিয়োগ হ'ল। পূর্ণবাবুর বিদায়-সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ইংরেজিতে মানপত্র রচনার জন্যে ছেলেরা আমাকে ধরেছিল। ছাত্রদের অনুরোধটি রাখতে হ'ল। মনে আছে, নবাগত অধ্যক্ষ র‍্যাম্‌স্‌বটম্‌ সভায় সংবর্ধনাপত্রের ভাব ও শব্দবিন্যাসের উল্লেখ করে জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন, রচনাটি কার। আমার চাকুরি এক বছর হ'য়ে গেলেও সে-বার স্থায়িভাবে পদমঞ্জুর না হওয়ায় কায়েমি হতে আরও একটি বছর লেগেছিল। আমার এক বছরের চাকুরি গণনার বাইরে চলে গেল। দশটাকা হারে সামান্য বেতনবৃদ্ধির সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হলাম। র‍্যাম্‌স্‌বটম্‌ সাহেব তেজস্বী পুরুষ, রাগী বলে তাঁর পরিচয় ছিল। কিছু কিছু আভাস অল্প দিনেই আমরাও পেলাম। কিন্তু আর একটি পরিচয়ও সেই সঙ্গে পাওয়া গেল। ভুল করে কারো প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করবার পর যখন তিনি বুঝতেন তাঁরই ভুল হয়েছে তখনই আন্তরিকতার

সঙ্গে ত্রুটিস্বীকার করতেন। কলেজের একজন বৃদ্ধ পরিচারকের কাছেও একবার তাঁকে ক্ষমা চাইতে দেখেছি। "মাফ্ কিজিয়ে, দুর্গাচরণ।"

কলেজে একটি 'রিসার্চ সোসাইটি' ছিল। আমাদের বহুপূর্বে প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সেটির প্রতিষ্ঠা করে এসেছিলেন। র‍্যাম্‌স্‌বটম্ সাহেব এসে ম্রিয়মাণ দশা থেকে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন। শুধু তাই নয়। তিনি তখন স্বতন্ত্র বাড়ী না পেয়ে সার্কিট হাউসে ছিলেন। অনেকদিন পরে তিনি সোসাইটির প্রথম অধিবেশন আহ্বান করলেন তাঁর বাসভবনে, সার্কিট হাউজে। সান্ধ্য-সম্মেলন, চা-পান ও একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ। প্রথম অধিবেশনেই প্রবন্ধ পড়বার দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধের বিষয়, BENGALI LITERATURE IN THE PRE-BRITISH PERIOD। মনে আছে, আমি তখন আচার ও আহারাদি ব্যাপারে রক্ষণশীল ছিলাম। আমার প্রবীণ সহকর্মী-বন্ধুদেরও কয়েকজন আমার সমপন্থী ছিলেন। সাহেব আমাদের অভ্যাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিবশতঃ কলেজের হিন্দু পরিচারকদের সাহায্যে মেটে কলসে জল; উৎকৃষ্ট ফলমূল ও সন্দেশ আনিয়ে বাইরে ঘাসের উপর আমাদের ক'জনের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার পঠিত প্রবন্ধ সাহেবের অনুরোধে ধারাবাহিকভাবে কলেজ-পত্রিকায় ছাপাতে হয়েছিল। অত্যল্পকালের মধ্যে আরও একবার তিনি কাছারি পাহাড়ের সংলগ্ন তাঁর বাংলোয় (এ ডি এম্ এর বাংলো) আমাদের আমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেন। সেবার তাঁর পত্নী ও কন্যা উপস্থিত থেকে আমাদের বিশেষ আদরযত্ন করেছিলেন।

একদিন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে একটি হঠকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম, ভয় হ'ল, সাহেব শুনে কি করে বসেন। কত লড়াই করে চাকুরিটুকু পেয়েছি, তা-ও এখনও পাকায়েমি। ঘটনাটি এই। শনিবারে শেষ ঘণ্টায় সাধারণতঃ কলেজে কোনও ক্লাশ থাকত না। কিন্তু বাংলার নতুন অধ্যাপক এসেছে, ক্লাশের সংখ্যা বেড়েছে। রুটিনে ফালতু ক্লাশ বসাবার জায়গা কোথায়? একজন প্রবীণ অধ্যাপক কার্যক্রম রচয়িতা, দিলেন বসিয়ে বাংলার একটি ক্লাশ শনিবারে শেষ ঘণ্টায়। তখন ছেলেদের হাজিরা বই থাকত অধ্যক্ষের গৃহে। সেখান থেকে অধ্যাপকদের নিয়ে এবং রেখে আসতে হ'ত। আফিসের সহায়কবৃন্দ শেষঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে শনিবারে পূর্বেই চলে গিয়েছেন। গ্রন্থাগারিক মহাশয় শহর-প্রবাসের

দু'দিনব্যাপী দুঃখের অবসানে শাম্পানে চড়ে জোয়ার ধরে পঙ্গীস্থ ভবনের দিকে যাত্রা করেছেন শনিবারে ছুটোর সময়। সমস্ত কলেজে একজন পরিচারকমাত্র অপেক্ষা করছে, সেও আমাকে খাতাখানি এগিয়ে দিয়ে বলে গেল সোমবারে কলেজে এসে যথাস্থানে রেখে দিতে। বাংলার ক্লাশ তো। "রঘুরপি কাব্যম্ তদপি চ পাঠ্যম্।" ভাবটা অনেকটা এই রকমের। সমগ্র কলেজে তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়ারা ও বাংলার উপাধ্যায় আমি ছাড়া কেউ নেই। পড়ুয়ারা কিন্তু প্রথম দিন থেকেই অপরিসীম আগ্রহে ও মনোযোগ দিয়ে বাংলার ক্লাশ করতে আসত। আজও বড়ো ক্লাশটি পরিপূর্ণ। ক্লাশে গিয়ে প্রতীক্ষারত ছাত্রদের বললাম, আমি আজ ক্লাশ নেব না। আমার অভিযোগ ও প্রতিবাদাত্মক মনোভাব তারা বুঝতে পারল, মনে আছে সেই দ্বিতীয় বর্ষ শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ-সংশ্লিষ্ট ও নিহত আমার মেধাবী ছাত্র শ্রীমান দেবপ্রসাদ গুপ্ত ছিলেন। সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কয়াধু' কবিতা পড়াবার কথা ছিল। দেবপ্রসাদ তাঁর ভাঙা ভাঙা গলায় অনুনয়ের সুরে বারংবার আমাকে ক্লাশ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি তাঁদের বলে দিলাম, অধ্যক্ষ মহোদয়কে যেন জানানো হয়, আমি শনিবারের শেষ ঘণ্টায় ক্লাশ নিইনি।

ছাত্রেরা আমার নির্দেশ মেনেছিল। সোমবারে সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। বলা বাহুল্য কাজটি করে ফেলে মনটা কিছু দমে গিয়েছিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ক্লাস নিইনি। খুব স্পষ্ট করে সাহসের সঙ্গে বাংলার প্রতি কার্যক্রম-নির্মাতার, আফিসের ও গ্রন্থাগারের কর্মীদের উপেক্ষার কথা জানালাম। সাহেব শুনে আমাকে বিদায় দিলেন। মুখে কিছু বললেন না। ক্লাস না নেওয়ার জন্যে কোন বিরক্তিও জানালেন না। পরের শনিবার দেখলাম, সমস্ত অফিস, গ্রন্থাগার সবই আমার ক্লাসের জন্যে খোলা রয়েছে। আমার ক্লাস শেষ হতেই অধ্যক্ষের বৃদ্ধ আর্দালি সন্ত্রস্তভাবে আমার হাত থেকে হাজিরাবই নিয়ে অধ্যক্ষের কক্ষে রেখে দিল। একটা কৌতুকের বিষয় মনে পড়ে। প্রবীণ গ্রন্থাগারিক ছিলেন চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী, এন্ট্রান্স-পাশ। জীবনে কখনও তিনি চট্টগ্রামের বাইরে সীতাকুণ্ড ষ্টেশনের পশ্চিমে কোথাও যান নি। নিজেই বলতেন একথা। মাথায় কাচা-পাকা চুল, তাম্বুল-রক্ত মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকত। শনিবারে বিকালে শহর থেকে গৃহস্থালির নানাবিধ দ্রব্য সওদা করে শাম্পানযোগে বাড়ী যেতেন, এর কোনও

ব্যতিক্রম হ'তনা। চিরকাল শহরে একা এক জমিদারগৃহে একটুকু ঠাঁই নিয়ে কাটিয়ে গিয়েছেন। বর্ণিত ঘটনার পর একদিন শনিবারে শেষ ঘণ্টার ক্লাসে পড়াবার সময়ে বারান্দায় কার যেন আনাগোনা শোনা গেল, একটি কাঁচা-পাকা মাথা নিয়ে কে যেন অধীরভাবে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছেন। পড়া থামিয়ে বাইরে এসে দেখি স্বয়ং গ্রন্থাগারিক মহাশয়। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করতেই বিপন্ন বিমর্ষ ভাবে আবেগের সঙ্গে বলে বসলেন,—হুজুর (তিনি, কি জানি কেন, আমার প্রতিও এই সম্বোধনটি ব্যবহার করতেন), "জোয়ার আইয়্যে"। আমি ব্যাপার বুঝলাম. তাঁর বুকের সঙ্গে ক'টি পোটলা আগলে প্রস্তুত হয়ে তিনি অধীর প্রতীক্ষা করছেন ক্লাস শেষ হওয়ার। ও-দিকে কর্ণফুলীতে জোয়ার এসে গিয়েছে, বুঝি জোয়ার বয়ে যায়! আমার মনে হ'ল, শুধু কর্ণফুলীতে নয়, বন্ধুর গৃহসুখপ্রত্যাশী প্রাণেও করুণ ঔৎসুক্যের জোয়ার এসেছে। আমি বিনীতভাবে তাঁকে বললাম, আপনি এক্ষুণি চলে যান। আজ থেকে প্রতি শনিবারেই আপনি জোয়ার এলেই চলে যাবেন, আমার ক্লাসের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবেনা। দেখলাম, আমার বয়ঃপ্রবীণ সরলপ্রাণ সহকর্মী গ্রন্থাগারিকের চোখে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অশ্রু। তিনি নিশ্চয়ই সেদিন এই অর্বাচীন অধ্যাপককে আশীর্বাদ করেছিলেন।

একটা হুকুম এল, কোলকাতা শিক্ষাদপ্তর থেকে। সরকারী কলেজে উপাধ্যায়েরা (লেক্‌চারেরা, প্রফেসারেরা নন), ক্লাস থাকুক আর নাই থাকুক, রোজ নির্ধারিত সময়ে কলেজে হাজির হয়ে হাজিরা-বহিতে নাম সহি করবেন। কোন কোন কলেজে এই সার্কুলার জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্যে পরিণত করা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশের ওপরওয়ালারা তখন ধরে আনতে বললে বেঁধে আনতেন। অধ্যক্ষ ব্যাম্‌স্‌বটম্‌ আমাদের ডেকে বললেন, "এই অর্থহীন বিধি তোমাদের মানতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।" তাঁর চিঠি গেল উপরে শিক্ষাদপ্তরে এই মর্মে। "আমার সহকর্মীদের কাজের জন্য আমি দায়ী। উপর থেকে তাঁদের দৈনন্দিন কর্তব্যপালন সম্পর্কে বিধিনিষেধ জারি না করলেই আমার পক্ষে কলেজ চালানো সোজা হবে।" এই চিঠির ফলে সমাধিস্থ হয়ে গেল সেই সার্কুলার। আমাদের অধ্যক্ষের প্রসাদে সমস্ত সরকারী কলেজের নন্‌-গেজেটেড অধ্যাপকবৃন্দের মর্যাদা রক্ষিত হ'ল সেবারকার মতো।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর নির্বাচনী-পরীক্ষা (Test Examination)। আবশ্যিক

বাংলার প্রশ্নপত্র বাংলার একমাত্র অধ্যাপক আমিই রচনা করেছিলাম। পাঁচখানি পাঠ্যগ্রন্থ, মেঘনাদ বধ প্রথম চার সর্গ, বৃত্রসংহার সমগ্র, কৃষ্ণকান্তের উইল, যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগরচরিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনাতন বিধান অনুসারে পাঁচখানি পাঠ্যপুস্তকের জন্য বরাদ্দ মাত্র চল্লিশ নম্বর। বাকি ষাট নম্বরে ব্যাকরণ, রচনা, অনুবাদ, ভাবার্থলিখন ইত্যাদি ইত্যাদি বর-ঠকানোর মতো হরেক-রকম ব্যাপার। পাঠ্যগ্রন্থগুলি আমরা যথাসাধ্য যত্ন করে পড়াতাম। ছেলেরাও গভীর মনোযোগের সঙ্গে আগাগোড়া পড়ত। পাঁচখানি বই থেকে দশটি প্রশ্ন করে তার চারটির উত্তর করতে বলা হয়েছে প্রশ্নপত্রে, তাতে চল্লিশ নম্বর। প্রশ্ন দেখতে দীর্ঘ হলেও পরীক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ও অভিপ্রেত। তখন রেওয়াজ ছিল ইংরেজিতে প্রশ্ন সংকলন করা। ভেবেচিন্তে খুটিয়ে সব বই থেকেই প্রশ্ন করা গিয়েছে। প্রশ্নপত্রটি দীর্ঘ, দপ্তরীদের বাঁধাই করতে হয়েছে। প্রশ্নসংখ্যাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। ছাত্রেরা এরূপ প্রশ্নের সাহায্যে পড়াশুনার নির্দেশ ও প্রেরণা পেয়ে খুশীই হ'ত, প্রশ্নের দৈর্ঘ্য অথবা দুরূহত্বের অভিযোগ করতো না।

সাহেবের ঘরে পরীক্ষার প্রশ্ন আনতে গিয়েছি আমরা অধ্যাপকেরা, ঘরে ঘরে যাঁরা চৌকিদার নিযুক্ত হয়েছিলাম সেদিন। মুদ্রিত সুদীর্ঘ প্রশ্নপত্র হাতে করে অধ্যাপক সহকর্মীরা মুচকি হাসলেন। দেখলাম, তারা নবাগত বাংলার অধ্যাপক এবং সদ্যঃ-প্রশ্রয়প্রাপ্ত উপেক্ষিত বিষয় বাংলার বাড়াবাড়িতে ইদানীং কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। আমিও মুদ্রিত আকারে প্রশ্নের দৈর্ঘ্য দেখে নিজেই একটু ঘাবড়ে গেলাম। না জানি, ছাত্রদের ও অধ্যক্ষ মহোদয়ের মনে এই প্রশ্নের কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে? সর্বদাই ভয় এত কষ্টের চাকরি। কি হয়? এখনও কায়েমী হইনি। পরীক্ষাগৃহে চৌকিদারীতে নিযুক্ত আছি। কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর এককোণে রক্ষিত কাষ্ঠাসনে বিশ্রামের জন্য বসলাম। পরীক্ষার্থীরা শান্তভাবে উত্তর লিখতে ব্যস্ত, কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ঘুম এসে গিয়েছে। হঠাৎ পৃষ্ঠদেশে চেয়ারের হাতল ধরে কে যেন দাঁড়িয়ে, তাঁর নিশ্বাসপতনের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে ত্রস্তভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখি স্বয়ং অধ্যক্ষ ব্যামস্‌বটম্‌ দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছেন নিদ্রাভঙ্গের জন্যে। হাতে আমারই চতুর্থবর্ষশ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষার বাংলার প্রশ্নপত্র একখানি

ধরিত্রী দ্বিধা হও! আকাশ ভেঙে পড় আমার মাথায়। মনে হ'ল চাকরি শেষ। অস্থায়ী অধ্যাপক পদের এইবার হ'ল খতম্। একে চৌকিদারিতে অনবধান, প্রহরীর পক্ষে তন্দ্রালুতার অমার্জনীয় অপরাধ। তাতে প্রশ্নপত্রের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য এবং দুরূহতা। দ্রুতগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদনানন্তর ক্ষমাপ্রার্থনা করলাম। সাহেব বললেন, ঠিক আছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে? তোমার প্রশ্নপত্র দেখছিলাম।—এই রে! এইবার প্রলয় ঘটবে, প্রশ্নের কঠোর সমালোচনা ও কর্মচ্যুতি। কিন্তু যা ঘটল তা সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বললেন, **"It is a nice paper that you have set. It is just the sort of paper that you should set. I congratulate you on your precise wording of the questions. As a matter of fact I am interested in some of the topics, for instance, in the contribution of the European Christian missionaries to the development of Bengali prose. Your questions are suggestive and stimulating."** "সুন্দর প্রশ্নপত্র রচনা করেছ তুমি। এইরকম প্রশ্নই করতে হয়। তোমার প্রশ্নগুলির সুপরিচ্ছন্ন ভাষার তারিফ করি। বস্তুতঃ প্রশ্নের কোন-কোন প্রসঙ্গে আমার কৌতূহল আছে, যথা ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্মযাজকদিগের বাংলা গদ্যবিকাশে দান। তোমার প্রশ্নগুলি ছাত্রদের প্রস্তুতির সহায়ক ও প্রেরণাদায়ক।"

ঘাম দিয়ে ভয়ের ভূত ঘাড় থেকে নেমে গেল। সাহেবের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ উৎসাহে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রসাদ বহুগুণ বেড়ে গেল। একজন প্রখ্যাতনামা আই. ই. এস. ইংরেজ অধ্যক্ষ। পদমর্যাদাবিহীন অর্বাচীন বাংলার উপাধ্যায়ের রচিত উপেক্ষিত বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নপত্র। সাহেব গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা পড়ে তারিফ করবার জন্তে ছুটে এসেছেন আমার কাছে। একে কি বলব? সারস্বতানুরাগ, কর্তব্যপরায়ণতা, না মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা? ইংরেজ এ-দেশ থেকে চলে গেছেন। ইংরেজিকেও ঝাড়ে-বনিয়াদে তাড়াবার জন্তে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছেন একদল শিক্ষাবিৎ। ইংরেজের কর্তব্যনিষ্ঠা ও অপরাপর সদ্‌গুণ আমরা কি সব অর্জন করতে পেরেছি ইংরেজ আমলে? আমরা এদেশের একালের ক'জন অধ্যক্ষ খবর রাখি কলেজের কোন্ পরীক্ষায় কোন্ বিষয়ের কে কিরূপ প্রশ্নপত্র রচনা করলেন?

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রেও মাঝে মাঝে শোচনীয় অবব্যান প্রকটিত হয় না কি?

একজন সহকর্মি-বন্ধু অপরিমিত পান খেতেন, তাঁর পকেট ও মুখবিবর প্রায় কখনও তাম্বূলবিহীন হ'তনা। একদিন পরীক্ষার চৌকিদারি করতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে জর্দা ও অপরাপর সুরভিদ্রব্য-সংযোগে আমেজ করে তাম্বূলচর্বণে রত আছেন এবং পিক্ ফেলতে ঘন ঘন বাইরে যাচ্ছেন। এমন সময়ে অভ্যাসমতো পরীক্ষাগৃহের তদারকে বেরিয়ে সাহেব তাকে ঐ-অবস্থায় দেখে গেছেন। সেখানে কিছুই বললেন না। ঘরে ঘরে গিয়ে বিস্তৃত এক নোটিশ জারি করলেন—কড়া চোস্ত ভাষায়। পরীক্ষায় চৌকিদারি কাজটি শ্রান্তি ও বিরক্তিজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু 'irksome work' বিরক্তিজনক কাজ নিষ্ঠা দিয়ে যথারীতি পালন করা কর্তব্যজ্ঞানের পরিচায়ক। এই কাজের ত্রুটির বিষয় অধ্যাপকদের সম্পর্কে confidential report রচনা করবার সময় মনে করা হবে। সব কাজই নিষ্ঠা দিয়ে করতে হয়। Work is worship—এই প্রবচনসহ নোটিশটি জারি হওয়ার ফল দীর্ঘকাল অনুভূত হয়েছিল চট্টগ্রাম কলেজে।

র‍্যাম্স্বটমের অধ্যক্ষতাকালে আমার বাংলার অধ্যাপকের পদের স্থায়িত্ব-বিধান ঘটে। এই উপলক্ষ্যে আমার কর্মনৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত রচনা করবার সময় আমাকে দাঁড় করিয়ে ফিতা দিয়ে মেপে আমার ছ'ফুট এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্য দেখে বলেছিলেন, "তোমাকে ঈর্ষ্যা করি, তুমি আমার চেয়ে এক ইঞ্চি বেশী লম্বা।" ঠিক এই সময়ে আমার পিতৃদেবের কঠিন পীড়ার সংবাদে আমাকে বাড়ী যেতে হয়। কোলকাতায় চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের পর তাঁর দেহাবসান হয়। সাহেব আমাকে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা জানিয়ে একখানি সুন্দর ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলেন। আমার ছোট ভাই ভোলানাথ চাটগাঁ কলেজে তাঁর ইতিহাসের ছাত্র ছিল। তাঁকেও স্বতন্ত্রভাবে তিনি সহানুভূতি জানান। তাঁর কাজকর্ম জুটবার সহায়তা করবার জন্য সাহেব চিঠিপত্র দিয়েছিলেন অনেক জায়গায়। বাবার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে চাটগাঁয় ফিরে গিয়ে অশৌচাবস্থায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। ছুটি পাওনা না থাকা সত্ত্বেও বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি। শ্রাদ্ধাদি সমাপন করে কাজে পুনরায় যোগ দিতে গিয়ে ক'দিন মুণ্ডিতমস্তকে ধুতিপাঞ্জাবী পরে কলেজে

যাই। তখন সরকারী কলেজে স্যুট অথবা ইজার চাপকান পরে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। আমিও দু'টি বছর স্যুট পরেছিলাম। আমার এই রীতিবিগর্হিত ধুতি পাঞ্জাবীতে সাহেবের বিরক্তি উদ্রেক করবে, এই বলে সহকর্মীরা কেউ কেউ সাবধান করে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, ধুতিচাদরে কলেজে এলে তাঁর কোনও আপত্তি আছে কিনা। সাহেব বললেন, Oh no! Why, why, should I have any objection? You look awfully fine with a dhoti and panjabi on. "আমার কোনও আপত্তি নেই। খাসা মানায় তোমাকে ধুতি ও পাঞ্জাবীতে"। চিরতরে খসে পড়ল তার অভয়বাণীতে এই কৃষ্ণাঙ্গ থেকে বিজাতীয় পরকীয় কঞ্চুক।

এই প্রবীণ আই. ই. এস.-এর দাবি লংঘন করে তাঁর অধস্তন অপর ব্যক্তি ডি. পি. আই নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর মূলে বোধ হয় ছিল, স্যাডলার কমিশণের কাছে তাঁর দেওয়া সাক্ষ্য, "A European Principal is a misfit is an Indian College." অকস্মাৎ খবর পেলাম আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করে মিঃ র‍্যাম্‌স্‌বটম এই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছেন। এর কিছুদিন পূর্বে তিনি রাজশাহী থেকে তাঁর ঢাকা কলেজের প্রখ্যাতনামা প্রাক্তন সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়কে ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক ও ভাইস-প্রিন্সিপালের পদে এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র সাহাকে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের পদে বদলি করিয়ে এনেছিলেন চাটগাঁ কলেজের উন্নতিবিধানের জন্য। বিদায় সংবর্ধনায় মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন অধ্যক্ষ র‍্যাম্‌স্‌বটম। বাংলাদেশ তথা চট্টগ্রামকে তিনি দ্বিতীয় মাতৃভূমির মতো দেখেছিলেন, তিনি বললেন। অশ্বিনীবাবু তাঁদের ঢাকার অতীত দিনগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, "এক সময়ে ঢাকার ইতিহাসের ছাত্ররা বলত, অশ্বিনীবাবু ছিলেন ইতিহাসের মহাভারত, আর র‍্যাম্‌স্‌বটম গীতা। Aswini Babu is vast, but Professor Ramsbotham gives the quintessence of things."—অশ্বিনীবাবুর পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়নের প্রসার বিস্তৃত, কিন্তু র‍্যামস্‌বটম সারগ্রাহী।

আর একটি কথার উল্লেখ না করলে এই মহাপ্রাণ বৈদেশিক শিক্ষাবিদের মনুষ্যমহিমার সম্যক্ প্রকটন হয়না। চাটগাঁর অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন সংঘটিত হয় তাঁর চট্টগ্রামে অধ্যক্ষতাকালে। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রাম-প্রবাসী ইংরেজদের মধ্যে ত্রাসের

সঞ্চার হয়েছিল এই ঘটনায়। তাঁরা ক'দিন শহর ছেড়ে জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শহরে সামরিক আইন জারির একটা কথা উঠেছিল। যে ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির এর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাবার ফলে চাটগাঁ সে-যাত্রায় সামরিক আইনের হাত থেকে রক্ষা পায়, মহাপ্রাণ র‍্যামসবটম্ এবং তদানীন্তন জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলিয়ামস্ (পরে Education Secretary) তাঁদের অন্যতম। আলিগড়ে বেশি দিন কাজ করেননি মিঃ র‍্যামস্‌বটম্। স্বাধীন-চিত্ততা অক্ষুণ্ণ রেখে দেশে ফিরে যান তিনি অত্যল্পকাল পরেই। কিছুকাল পরে একদিন কাগজে দেখলাম, প্রখ্যাতনামা শিক্ষাবিৎ ও ইতিহাসের অধ্যাপক রিচার্ড বেরি র‍্যামস্‌বটম্ দেশে দেহরক্ষা করেছেন। সারাজীবন মানুষ গড়বার কারখানায় মজুরি করে জীবন-সায়াহ্নে পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে যে ক'টি বিরাট্ মনুষ্যমূর্তি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করি অধ্যক্ষ র‍্যামস্‌বটম্ অবিসংবাদিতভাবে তাঁদের মধ্যে একজন।

বরণীয়

"বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে,
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।"

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

উনিশ-শো-সতেরোর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছি গ্রামের স্কুল থেকে। প্রশ্ন-পত্র বের হয়ে যাওয়ায় দু' দু'বার পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। তৃতীয় বার বসতে হয়েছিল পরীক্ষায়। ফল প্রকাশের জন্য অধীর প্রতীক্ষা চলছে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছি, আত্মীয়ের বাসায়। তাঁর কর্মস্থল প্রেসিডেন্সি জেল, বাসা আলিপুরে, জেলের নিকটে। এবার ধরে মাত্র দু'বার কোলকাতায় আসা হয়েছে। রাস্তায় বেরুলে চোখ দু'টি বিস্ময়ে কৌতূহলে বিস্ফারিত হয়ে যায়। ফুটপথ ধরে চলতে চলতে পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন-সাহিত্যের মাধ্যমে পরিচিত রাস্তাগুলি সনাক্ত করবার আনন্দে নিজেকে ক্রাইস্টোফার কলাম্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা জাঁদরেল-গোছের প্রত্নবেত্তা বলে মনে হ'ত।

একদিন ভার পেলাম, শক্তি ঔষধালয়ের ভবানীপুর শাখা থেকে চার আনা দামের একসপ্তাহ মকরধ্বজ ও দশ পয়সা মূল্যের এক কৌটা দশনসংস্কার চূর্ণ কিনে ফেরবার পথে জগুবাবুর বাজার থেকে কিছু ফল নিয়ে বাসায় ফিরে আসবার। লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাবার পথনির্দেশ পেয়েও মনে হ'ল এত বড়ো দায়িত্ব বহন করবার জন্যে যে দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয় তা নিশ্চয়ই অসামান্য। 'রোয়াইল স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক অধ্যক্ষ মথুরামোহন চক্রবর্তী'র সুদর্শন চিত্রসংবলিত বিজ্ঞাপনদৃষ্টে রসা রোডে শক্তি ঔষধালয় এত সহজে মিলে গেল যে আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও অধ্যবসায় থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কতকটা নৈরাশ্যের বেদনা অনুভব করলাম। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় দুই পদ দ্রব্য সংগ্রহ করে নির্দেশ মতো রসা রোডের পূবের ফুটপাথ ধরে জগুবাবুর বাজারের দিকে চলেছি। হঠাৎ একটি বৃহৎ দ্বিতল (তখন বোধ হয় ত্রিতল নয়) গৃহের সামনে এসে মর্মর-প্রস্তরে উৎকীর্ণ একটি নামের ফলক দেখে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে এবং অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের আনন্দে অভিভূত হ'লাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম, বারংবার নামটি পড়তে লাগলাম—SIR ASUTOSH MOOKERJI, যেন বিশ্বাস করতে পারছিনে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বারান্দায় বড়ো বড়ো থামের পাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে, পায়রার মতো। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে

হলেও পড়াশুনার সূত্রপাত থেকে একজন খুব বড়ো মানুষ হিসাবে এই নামটি শুনে আসছি। এই নামের সঙ্গে যুক্ত উপাধি ও বিশেষণগুলি মুখস্থ করবার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছি। এঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বিশাল প্রাণ, অপরাজেয় পৌরুষ, অপরিমেয় কর্মশক্তি, কুলিশকঠোর অথচ কুসুমকোমল লোকোত্তর মনুষ্যমহিমার অসংখ্য অবিস্মরণীয় কাহিনী শুনে এসেছি। হঠাৎ একেবারে এসে পড়েছে আমার কাছে দেশের এত বড়ো একজন মানুষের নিজবাড়ী। সাহসে ভর করে এ বাড়ীতে ঢুকে গিয়ে একবার তাঁকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে দেশে ফিরে গিয়ে গল্প করবার কত বড়ো একটি সুযোগ অমনি-অমনি মিলে গেল। এ-সুযোগ কি ছাড়া যায়?

একটা ফন্দিও চট্ করে মাথায় এসে গেল। দু'দিন আগে ভবানীপুর কাঁসারী-পাড়ায় হাইকোর্টের উকিল আমাদের স্বগ্রামবাসী বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি তাঁর গ্রামের স্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীর প্রথম ছাত্র বলে তিনি আমাকে চিনতেন ও স্নেহ করতেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র সেবার সাউথ সুবার্বান স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিল। সে ভালো ছেলে, শুনলাম তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সহপাঠী শ্যামাপ্রসাদ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। তবে তো একটি সূত্র পাওয়া গেল! অর্বাচীন গ্রাম্য বালকের যুক্তিতে, এই সূত্র ধরে নিশ্চয়ই স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, অন্ততঃ তাঁর প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে দেখা করা চলে। জোড়াতালি-দেওয়া যুক্তির সূত্রটি এমন। স্যর আশুতোষ ভাল ছেলের বাবা। আমাদের গ্রামের বড়ো উকিল বঙ্কিমবাবু একজন ভালো ছেলের বাবা। আর আমিও, আমার মতে, কি মন্দ ছেলে? সুতরাং স্যর আশুতোষের সঙ্গে দেখা করা অসমসাহসিকতা হবে না নিশ্চয়।

কাছের মণিহারী দোকান থেকে ফুলস্ক্যাপ কাগজ ও একটি পেন্সিল কিনলাম, এক আনার পেন্সিল-কাটা কলও কিনে ফেললাম। বাড়ীর দারোয়ানের অনুমতিক্রমে তাঁর পাশে বসে একটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের সবটা ভরে সদ্য-কলে-কাটা সূক্ষ্মাগ্র পেন্সিলে দরখাস্ত লিখলাম, দর্শনপ্রার্থী হয়ে। দরখাস্তের অদ্ভুত (এবং আমার মতে অকাট্য) যুক্তির ধারাটা কতকটা এইরূপ। আমি একজন প্রবেশিকা পরিক্ষার্থী। সেইবারকার গ্রামের স্কুলের প্রথম শ্রেণীর আমি প্রথম ছাত্র। শিক্ষক মহাশয়েরা আশা করেন, সেবার আমি সেনহাটি স্কুল

থেকে সরকারি বৃত্তি পাব। বাড়ীর অবস্থা ততো ভালো নয়। ভালো কলেজে কোথায়, কি করে পড়ব, কবে ফল বেরুবে, ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ চাই। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান সময়ের উপর হানা দেবার পক্ষে এই যুক্তি যে কতো অকিঞ্চিৎকর সেটি খেয়াল হবার মতো আক্কেল তখন এ অর্বাচীনের হয়নি।

অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেয়ে গেলাম। আফ্-শোষ হ'ল, সেনহাটি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছাত্রের অত সাধের অত ভালো ইংরাজিতে-লেখা (?) দরখাস্তের সবটা না পড়েই বুঝি অন্তর্যামী স্যর আশুতোষ দর্শনার্থীর প্রার্থনা পূরণ করেছেন। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠলাম, ভয়ে-ভয়ে পা টিপে ডাইনের ঘরে ঢুকলাম। গম্-গম্ করছে এক-ঘর লোক; বিশিষ্ট, গণ্যমান্য, নানাবয়সের, নানাজাতির, নানাভাষাভাষী, নানাধর্মাবলম্বী। বাইরের বারান্দায়ও প্রতীক্ষারত দর্শনার্থীর জনতা। কক্ষে প্রবেশ করে সংশয়ের অবকাশ রইল না, আবাল্য-শ্রুত মহামহিমান্বিত নামটির অধিকারী বিরাট শক্তিধর পুরুষ কোন্ জন। ভয়-ভক্তি-মেশানো এক বিচিত্র অনুভব নিয়ে আর্দ্রগাত্রে সমাসীন সেই কল্পনা কিংবদন্তী ও খেয়ানের ধনের দিকে তাকিয়েই চোখ নত করতে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত-গম্ভীর অথচ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সস্মিত মুখে প্রশ্ন হ'ল, "কি-জন্যে এসেছ? আমাকে দেখতে এসেছ, কেমন?" এই রে, ধরা পড়ে গেছি! আমার এত সূক্ষ্মবুদ্ধি অন্তর্যামী মর্মভেদী দৃষ্টির কাছে হার মেনে গেল। আমার ভয়ার্ত ও আড়ষ্ট উত্তরের মধ্য দিয়ে আমার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবর, গ্রাম ও পরিবারের খবর জেনে নিলেন করুণার্দ্রচিত্ত মহাপুরুষ। উত্তর দেবার ফাঁকে ফাঁকে আপাদমস্তক তাঁকে দেখতে লাগলাম। বুঝি তা-ও তাঁর অগোচর রইল না। শেষের দিকে বে-কুপের মতো অনুনয় জানালাম, পরীক্ষার ফল আমার কেমন হয়েছে, স্কলারশিপ পাব কিনা, জানতে চাই। হেসে বললেন, "পরীক্ষার ফল বেরুতে এখনও এক মাস দেরি। আমার কাছে তো সমস্ত পরীক্ষার সব পরীক্ষার্থীর নম্বর এসে জড়ো হয় না। ফল বেরুলে আমার সঙ্গে দেখা করো। স্কলারশিপ যদি পাও তাহলে তো পড়াশুনোর সুবিধে হয়ে যাবে। তোমাদের গ্রামের কাছে ব্রজলাল শাস্ত্রীর দৌলতপুর কলেজ আছে। সেখানে পড়তে পার। আর যদি কোলকাতায় পড়তে আস তখন আমার সঙ্গে দেখা করবে।" এই বলে আবার হেসে আমাকে বিদায় দিলেন। এত বড়ো কাজের

মানুষের প্রায় দু' মিনিট সময় অর্বাচীন গ্রাম্য বালকের প্রার্থনাপূরণে ব্যয়িত হয়েছিল। বিদায়ের মুহূর্তে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করবার দুঃসাহস অবলম্বন করেছিলাম। পল্লীবালকের অসঙ্গত খেয়াল চরিতার্থ করে তাকে অভয় প্রদান করতে গিয়ে অতি-মূল্যবান সময় অপচয় করার আড়ালে কত বড়ো বিশাল প্রাণ লুকানো ছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অননুকরণীয় মহাপুরুষ-প্রশস্তিতে তা ব্যক্ত করেছেন,

"হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল নবনালন্দা শিক্ষাগেহ,
দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে বিথারি' পক্ষি-মাতার স্নেহ।"

উনিশ-শো-উনিশ থেকে উনিশ-শো-একুশ এই দু' বছর সংস্কৃতে অনর্স নিয়ে সংস্কৃত কলেজে বি. এ. পড়ি। পাশে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজিতে অনর্স নিয়ে পড়েন স্যর আশুতোষের দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ। আমাদের বছর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। আমাদের পূজনীয় অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে শ্যামাপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে এসে সামনের দিকে কাঠের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। দেখা হ'ত, খুব বেশি আলাপ জমেনি তখন। সমবয়স্ক হলেও তখনই তাঁকে অনেক প্রবীণ ও রাশভারি দেখাত। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে আমার পূজনীয় প্রখ্যাতনামা দুই গুরুর মধ্যে এক তীব্র বিরোধের সংঘটন হয়। শিক্ষাজগতে সে-ঘটনা অল্পবিস্তর সকলেরই সুবিদিত ছিল। নিয়তির চক্রে সেই প্রবল দ্বন্দ্বের মাঝখানে কোন উপলক্ষ্যে এই দরিদ্র জীবনসংগ্রামী পাঠার্থীকে পড়তে হয়েছিল। তাতে একের রোষ ও অপরের তোষ তাঁদের এই অধম ছাত্রের উপর বর্ষিত হয়। সেই বেদনাপ্রদ কাহিনীর অবতারণা না করে জীবনের এই পর্বে যুগল গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করি। শুধু ফলশ্রুতির উল্লেখটি এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। অনেক আশাভরসা ও সাধনার লক্ষ্য সংস্কৃত অনর্স ছাড়াই বি. এ. পরীক্ষা দিতে হ'ল, ডিস্‌টিংকৃশনে সব-বিষয়েই অনাবশ্যক-ভাবে-ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করে তৃপ্ত থাকতে হ'ল। পাশ-কোর্সের গ্রাজুয়েট পরিচয়ের অখ্যাতি সারাজীবন ধরে বহন করেছি।

দেশে তখন জোর অসহযোগ আন্দোলন চলছে। সংস্কৃত কলেজের সামনের ফটকে পিকেটিং চলছে। দাঁড়িয়ে দেখছি। এমন সময় স্বভাবসুলভ ত্বরিতপদে এসে পণ্ডিত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে পাকড় করে ধরে নিয়ে চললেন

দ্বারভাঙ্গা সৌধের দিকে। সেখানে আমাকে নিয়ে দোতলায় পূবের বারান্দার কাছে পোস্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিল-এর প্রেসিডেণ্টের কক্ষে ঢুকলেন। এই আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার লোকোত্তর-মহিমান্বিত পুরুষ-শার্দূলের সহিত। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসাবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন সংস্কৃত কলেজের পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে। অকপটে কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করলাম এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে যা জানি তা বললাম। তাঁর ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে কে-ই বা পারে সত্য গোপন করতে? বিদ্যাভূষণ মহাশয় এর পরে আমাকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। সেখানে এসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এবং তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নির্দেশে স্যর আশুতোষের কাছে যে-কথাগুলি বলেছিলাম তাই ইংরেজিতে বিবৃতির আকারে লিখলাম। শ্যামাপ্রসাদ ও যোগেশবাবু আমার লেখার ভাষার কিছু কিছু পরিবর্তন করে দিলেন। এর পরে এই বিষয়ে আমার কতকগুলি চিঠি SERVANT, নায়ক, এবং বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সূত্রে এই পত্রিকাসমূহের সম্পাদক দেশবরেণ্য শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কাছে আমাকে মাঝে-মাঝে যেতে হয়েছিল।

উনিশ-শো-তেইশে এম. এ. পরীক্ষা স্থগিত রাখতে হয় আমাকে। সেবার নতুন বি. সি. এস. পরীক্ষার প্রবর্তন হ'ল। শুভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ দিলেন বি. সি. এস. পরীক্ষা দিতে। তখন আচার্য দীনেশচন্দ্রের আশ্রয়ে তাঁর বাড়ীতে থেকে পূর্ববঙ্গগীতিকা সম্পাদন-কার্যে সহায়তা করি। বি. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার লাভ করবার জন্য প্রথমে কলেজের অধ্যক্ষের মনোনয়ন এবং পরে নির্বাচন-সমিতির অনুমোদন লাভ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর কলেজ থেকে অধ্যক্ষেরা প্রত্যেকে ছয় থেকে বারোজন করে সর্বসমেত তিন-শো গ্রাজুয়েট মনোনীত করবেন। উপরের নির্বাচন-সমিতি (যার সেক্রেটারি ডি. পি. আই. এবং প্রেসিডেণ্ট রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য) তার থেকে এক-শো ছাটাই করে দু'শোকে শেষ পর্যন্ত বি. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার দেবেন। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত কলেজের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহোদয়ের বৈরূপ্যের ফলে কলেজের মনোনয়ন পেলাম না। মনে হ'ল, যাই একবার ৭৭নং রসা রোডে। এই তৃতীয় সাক্ষাৎকার। কাছে গিয়ে পায়ের

খুশি নিয়ে একটু বিশদভাবে পূর্ববৃত্তান্ত গুছিয়ে বলতে শুরু করতেই তিনি বললেন, "অত বলতে হবে কেন আমাকে?" হঠাৎ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, "আপনার যদি মনে না থাকে।" অমনি শুনলাম জলদগম্ভীর কণ্ঠোৎসারিত একটি অবিস্মরণীয় বাক্য, "I am not the man who forgets." বাক্যটি যে বাগ্মীর বাগ্মিতা বা জীবনের পুরোভাগে অধিষ্ঠিত নেতৃপুরুষের অভিনয় নয়, তা এদেশের সহস্র সহস্র সারস্বতব্রতী ও দুর্গত ছাত্র-শিক্ষক প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করতেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোনও কথা বা তাঁর দেওয়া কোনও আশ্বাস কখনও ভুলতেন না। যাঁরা কথা দিয়ে ভুলে যান তাঁদের দলের লোক তিনি ছিলেন না। এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে তদানীন্তন পোস্টগ্রাজুয়েট সেক্রেটারি ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত চিঠি পেলাম, বি. সি. এস. পরীক্ষার জন্য স্নাতকোত্তর বিভাগ-কর্তৃক মনোনীত বারোজন ছাত্রের মধ্যে প্রথম নামটি আমার। সুবিচারপরায়ণ শরণাগত-বৎসল ক্ষিপ্রকর্মা কোন্ মহাপুরুষের কৃপায় এটি সম্ভব হ'ল, অনুমান করতে দেরি হ'ল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের-দেওয়া মনোনয়ন টিকল না। প্রতিকূল কোনও প্রবল শক্তি সরকারি দপ্তরে কাজ করেছিল। উপরের নির্বাচন-সমিতি যে এক-শো'কে ছাটাই করেন তার মধ্যে দুর্বল আমিও পড়ে গেলাম। আর একবার গেলাম রসা রোডের বাড়ীতে। আমার মনোনয়ন বাতিল হওয়ার সংবাদে তিনি দুঃখিত হলেন। তখন সরকারি শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে তাঁর চলেছিল মনকষাকষি। আমাকে বললেন, "এই ব্যাপারে এর পরে আর কিছু করে লাভ নেই।" কিন্তু হতাশা-ক্লিষ্টকে সান্ত্বনা দিলেন যে ক'টি কথায় তা অবিস্মরণীয়, তা কল্যাণকর্মা ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষের আশীর্বাদ। "ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হ'তে পারলে না, তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই। তোমাকে আফশোষ করতে হবে না এর জন্যে। ভালো করে আসছে-বছর এম. এ. পরীক্ষাটি দিয়ে দেও। জীবনে হাকিমির চেয়ে অনেক বেশি ভালো কাজ করতে পারবে।" আমার এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া এবং কর্মজীবনে প্রবেশ করার পূর্বেই সাধনোচিত ধামে চলে গেলেন স্যর আশুতোষ। দেশ ও জাতির শিক্ষাজগতের সে যে কত বড়ো সর্বনাশ সেদিন প্রতিটি দেশবাসী তা অনুভব করেছিলেন।

এম. এ. পাশ করে বরণ করে নিলাম যে-কাজ সবাই জানেন তা তাঁর অতিপ্রিয়।

তাঁর প্রিয় কার্য ভালবাসা দিয়ে করতে পেরেছি, এবং যাঁদের নিয়ে ও যাঁদের জন্যে সে-কাজটি করে চলেছি তাঁদেরও হৃদয়-বেদ্য করে তুলতে পেরেছি, এর চেয়ে বড়ো আত্মতৃপ্তি আর কিসে পাব? ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ সান্ত্বনা-ব্যপদেশে আশীর্বাদ করেছিলেন। অমোঘ সেই ব্রাহ্মণবাক্য। স্যর আশুতোষের সঙ্গে সেই ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎকার, জীবনে চলার পথে তাতে আমার গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। আজ স্মৃতিভারাক্রান্ত বেদনার্ত চিত্তে প্রণাম জানাই,

"পিতৄন্ নমস্তে দিবি যে চ মূর্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

বাংলা তেরশো-একত্রিশ সালের বর্ষাকাল, আষাঢ় মাস। নৈহাটি-কাঁটাল-পাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব। সেবার সভাপতি বৃত হলেন দীনেশচন্দ্র সেন। পূর্ববঙ্গ-গীতিকা-সম্পাদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিভোগী সহায়ক হিসাবে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের গৃহেই আশ্রিত হয়ে আছি আমি। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। প্রবল বর্ষণের মধ্য দিয়ে হ'ল দিনটির সূত্রপাত। আচার্যদেবের মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখা দিল। গ্রন্থসমাকীর্ণ গৃহকোণটি ছেড়ে বাইরে যেতে হ'লে, বিশেষ করে, সতত-সঞ্চরমাণ লেখনীটির বিরাম দিতে হ'লে তিনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতেন। অথচ পৃথিবীর যে-অংশটির নাম বাংলাদেশ সেই দেশের অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে এমন করে জানতে ও ভালবাসতে আর ক'জনকে দেখেছি, তা জানিনে।

দিবসারম্ভে সেদিন প্রকৃতি ছিল দুর্যোগময় বর্ষণমুখর। আচার্যদেব আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে বললেন। সববিষয়েই তিনি কিছু আগেভাগেই তৎপর ও ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠতেন। বলা বাহুল্য, এটি ছিল তাঁর আন্তরিকতা ও কর্তব্যানুরাগের একটি দিক্। ভরসার বিষয় দুপুরের দিকে বর্ষণের বিরাম এবং মেঘান্তরিত রৌদ্রপ্রকাশ হল। তখনই প্রবীণ সাহিত্যরথী সদলবলে কাঁটাল-পাড়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। যতদূর মনে আছে, আচার্যদেবের তৃতীয় ও

পঞ্চম পুত্রদ্বয় যশস্বী প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ডাঃ বিনয়চন্দ্র সেন ও ডাঃ শ্রীচন্দ্র সেন, কবিরাজ সত্যচরণ সেন প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি সঙ্গে ছিলেন।

সভার কাল অপরাহ্ণ চারটা। সভার বহু পূর্বেই সভাপতি এসে গিয়েছেন। আমরা মণ্ডলী করে তাঁকে নিয়ে বঙ্কিম-ভবনের দর্শনীয় সবকিছু দেখে সময় কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। আংশিকভাবে রেলওয়ে-কবলিত ভগ্ন ইষ্টকপুরী, দীর্ঘনিশ্বাস যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে বাঙালী জাতির কৃতঘ্নতা ও আত্মবিস্মৃতির পরিচয় ঘোষণা করছে। বঙ্কিম-ভবন পরিক্রমাকালে আলোকচিত্রের মতো আমাদের মানসপটে জেগে উঠেছিল বঙ্কিমের নানা উপন্যাসে বর্ণিত পরিবেশ—দরদালান, পূজামণ্ডপ, কৃষ্ণকান্তের বৈঠকখানা, ভ্রমর-সূর্যমুখীর অন্তঃপুর, আনন্দমঠের 'অনন্যমাতৃক' সন্তানগণের নিভৃত স্বল্পালোকিত সাধন-কক্ষ এবং এমন আরও কত-কিছু। মাঝে মাঝে ভট্টপল্লীর আর্দ্রগাত্র উপবীতধারী ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর কৌতূহলাক্রান্ত প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হতে হল। প্রশ্নের ভাষায় সম্ভ্রম-মিশ্রিত সমাদর। "দীনেশচন্দ্র সেন কোন্ জন?" ইনি কি সেই 'সতী'-লেখক? 'রামায়ণী কথা,' 'জড়ভরত,' 'ধরাদ্রোণ', 'কুশধ্বজ', 'বেহুলা' প্রভৃতি গ্রন্থ যাঁর লেখনী-প্রসূত? যিনি চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির সুমধুর পদাবলীর মর্মগ্রাহী ব্যাখ্যাতা? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হ'ল। বোধ হয়, পূজার দালানের সম্মুখের প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপ রচিত হয়েছিল। বাঁশের খুঁটিতে সামিয়ানা টাঙিয়ে মাটিতে সতরঞ্চ ও চট বিছিয়ে সভার আসর রচনা করা হয়েছিল। মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি মঞ্চও প্রস্তুত হয়েছিল সভাপতি এবং স্বল্পসংখ্যক বিশিষ্ট অভ্যাগতদিগের 'নাত্যুচ্ছ্রিত নাতিনীচ' আসন। বিশিষ্টদের মধ্যে যাঁরা সেদিন সেই সভায় বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নৃতত্ত্ব-বেত্তা রমাপ্রসাদ চন্দ ও অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য। ভট্টপল্লীর প্রাতঃস্মরণীয় মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন ও অপরাপর পণ্ডিত-মহাশয়দিগেরও পদধূলি পড়েছিল সেই সভায়। অনুরূপ সভাসমিতিতে মহানগরী কলিকাতায় যেরূপ জনসমাবেশ হয় তার থেকে সেদিনকার শ্রোতৃসমাগম ঈষৎ পৃথক্‌ধরণের ছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীতে সুপ্রাবৃত নাগরিক ছিলেন অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক, আর্দ্রগাত্র অথবা উপবীত ও উত্তরীয়ধারী সহৃদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত-সহকারে যথারীতি সভার উদ্বোধন হ'ল। তার পরে

বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দের বক্তৃতা ও প্রস্তাবগ্রহণ। সর্বশেষে সভাপতির অভিভাষণ ('ভাষণ'-পরিভাষাটি তখনও চালু হয়নি)। অভিভাষণটি সুদীর্ঘ ও সুলিখিত, মনন, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিণত ফল। দেশবরেণ্য প্রবীণ সারস্বত তাঁর স্বভাব-সুলভ আবেগের সঙ্গে নিজস্ব প্রাণস্পর্শী ভাষায় জাতীয় পিতৃপুরুষের ঋষিকৃত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি অভিভাষণের প্রথম ভাগে ব্যক্ত করলেন। প্রবীণ ও নবীন সভাসদেরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শ্রবণ করলেন। অভিভাষণের পরবর্তী অংশে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা হ'ল। তখন দীনেশচন্দ্রের মনোলোকের অনেকখানি স্থান অধিকার করে বসেছিল নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর পূর্ববঙ্গীয় পল্লীকবির রচিত গীতিকা-সমূহ। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার নায়িকা মহুয়া মলুয়া কাজলরেখা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-সন্ততি ভ্রমর-সূর্যমুখী, প্রফুল্ল-দলনী, শ্রী-জয়ন্তী, শৈবলিনী-মৃণালিনী-কপালকুণ্ডলার তুলনা প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্রের একটি প্রতিপাদ্যের আভাস এখানে ফুটে উঠেছিল। প্রতিপাদ্যটি এই। এ-দেশের প্রাচীন সমাজে নির্বাধ নরনারী প্রেমের আবহ বইত। যাঁরা বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকারা সবখানি রোমান্টিক অথবা বিদেশিনী (outlandish) তাঁরা ঠিক বলেন না। তার প্রমাণ, মৈমনসিংহ-গীতিকার মহুয়া-মলুয়া, অথবা মনস্বিনী শরীরিণী চন্দ্রাবতী।

দীনেশচন্দ্রের মতে, মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য-শাসনের কঠোরতার ফলে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল তাতে অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের অলীক স্মার্ত কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছিল। 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'টির মতো যে যৌবন-ভারাক্রান্তা পর্বতরাজদুহিতাকে আশ্রয় করে কন্দর্প কপর্দীর তপোভঙ্গের দুঃসাহসে ব্রতী হয়েছিলেন, যাঁর পরিকল্পনায় উজ্জয়িনীর রাজকবির 'একস্থ-সৌন্দর্য-দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত হয়েছিল, তিনি অষ্টমবর্ষীয়া ছিলেন, একথা বাঙালী নব্যস্মৃতি-কারের উদ্ভট বাস্তব-বিরোধী কল্পনার সৃষ্টি। প্রতিপাদ্যটির উপর প্রবীণ সাহিত্য-রথী অতিমাত্রায় জোর দেওয়ায় তাঁর সারগর্ভ অভিভাষণে পরিমাণ-সামঞ্জস্যের হয়ত কিঞ্চিৎ হানি হয়েছিল। স্মৃতিশাস্ত্রের এই সমালোচনার অংশ যখন পঠিত হয় স্থানীয় রক্ষণশীল শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখেমুখে তখন অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার একটি ভাব দেখা দিয়েছিল। ক্রমশঃ প্রাচীনপন্থীদের প্রত্যাশাভঙ্গ ও ধৈর্যচ্যুতির আভাস প্রকটিত হয়ে উঠল।

প্রাবৃট্‌কালের আকাশের এক কোণে আগে থেকেই একখণ্ড কালো মেঘ

দেখা দিয়েছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাসে অবিকল যেমন বর্ণনা পাওয়া যায়। হঠাৎ মেঘখণ্ড আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। দমকা হাওয়া বইতে লাগল। সভা-জনতার মানসী-প্রতিক্রিয়া যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের রূপ পরিগ্রহ করল। একটি বাঁশের খুঁটি হঠাৎ উপড়ে যাওয়ায় চাঁদোয়ার এক অংশ ঝুঁকে সভাস্থিতদের মাথার উপরে এসে পড়ল। প্রায় সকলেই সভাস্থল ত্যাগ করবার জন্যে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। যতদূর মনে পড়ে, হট্টগোলের মধ্যে কোন কোন পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে দেবভাষায় উপনিবদ্ধ একটি অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, "বিনিপাতঃ বিনিপাতঃ।" সভাপতির স্বজনবর্গ আমরা ত্রস্তভাবে বহুমান্য সাহিত্যরথীকে বেষ্টন করে দাঁড়ালাম। উদ্যোক্তারা সভায় শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য বারংবার প্রয়াসী হলেন। খুঁটি পুতে সামিয়ানাটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করবার চেষ্টা চলল। অল্পকালমধ্যে আকস্মিক ঝঞ্ঝার বেগ মন্দীভূত হয়ে এল।

তখন অদূরে ঘনঘন জনগণ-কণ্ঠোচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি শ্রুত হ'ল। ধ্বনির উৎস-নির্ধারণের জন্য সকলে উৎকর্ণ হলেন। একটা হর্ষবিষাদ ত্রস্তপুলকে পরিণত হল। সহসা সবাই আবিষ্কার করলেন, বিপুল জনতা একটি মানুষকে গরুর গাড়ীতে বসিয়ে নিজেরাই অসীম আগ্রহে ও ভক্তিভরে টেনে নিয়ে আসছে। তাদের কণ্ঠে উল্লাস ও উন্মাদনাময় শ্রবণমঙ্গল শ্রান্তিহরণ 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র। মাঘের 'শিশুপাল-বধ' কাব্যের 'ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি'র মতো সেই জনগণ-বহিত মনুষ্যমূর্তি স্পষ্টতর হয়ে জনগণ-মন-অধিনায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনে পরিণত হলেন।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহারাজীব অজস্র উপার্জন ও অমিত বৈভব পরিহার করে দেশোদ্ধার ব্রত অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। ত্যাগ-মন্দাকিনীর পূতধারা বহিয়ে শঙ্খঘণ্টা বাদন করে যুগ-ভগীরথ চলেছেন দেশসেবার অভিনব পন্থা 'খননি স্ববলে।' সেদিন পার্শ্ববর্তী এলাকায় কলের মজুরদের মধ্যে গুরুতর অশান্তি ও বিক্ষোভের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই অনর্থ-নিবারণের জন্যে কর্মক্লান্ত চিত্তরঞ্জন কর্তব্যবুদ্ধিতে প্রাণের তাগিদে সেখানে এসে পড়েছিলেন। সেখানে এসে তিনি শুনেছিলেন, কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমস্মৃতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রমিকদের সম্পর্কে তাঁর কর্তব্য পালন করে তিনি রবাহুত হয়ে সভাস্থলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অন্য দ্রুততর যানবাহনের সাময়িক অভাবে শ্রমিকেরা

বিপুল উৎসাহে তাঁকে গরুর গাড়ীতে করে নিজেরাই টেনে নিয়ে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি সহকারে 'বন্দেমাতরম্'-এর গঙ্গোত্রীর দিকে ছুটে এসেছে। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ যেন সঙ্কটকালে বিপদবারণ হয়ে সভাপণ্ডপে দেখা দিলেন।

বিশৃঙ্খল সভা-পরিবেশ দেখে স্বল্প জিজ্ঞাসাবাদের সাহায্যে সমস্ত অবস্থা ক্ষিপ্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তিনি করজোড়ে সভা-জনতাকে শান্তভাবে আসন গ্রহণ করবার অনুরোধ জানালেন। বলাবাহুল্য, আন্তরিকতাপূর্ণ সে-অনুরোধ পলকের মধ্যে পালিত হ'ল। বিধ্বস্তপ্রায় সভায় শান্তি, শৃঙ্খলা, প্রত্যাশা ও অনুপ্রাণনার ভাব অল্পকালের মধ্যে ফিরে এল। সভাপতি আচার্য দীনেশচন্দ্রের অনুমতি গ্রহণ করে দেশবন্ধু 'দু'একটি কথা নিবেদন' করবার জন্যে দাঁড়ালেন। গায়ে অর্ধমলিন ফতুয়া, পরনে মলিন খদ্দরের ধুতি। তৈলহীন রুক্ষ কেশ। বক্তৃতা-শ্রান্ত ভাঙ্গা গলা, প্রাণস্পর্শী প্রত্যয়-জাগানো ভাষা। প্রথমেই সভাপতি সম্পর্কে কিছু বললেন। তার মর্ম কতকটা এইরূপ। আজ যে প্রবীণ পিতামহকল্প সাহিত্যরথীকে বঙ্কিমবন্দনার পুরোহিতপদে আপনারা সাদরে বরণ করে এনেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুমধুরভাষিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী' মা-টিকে এঁর মতো করে ভালবাসতে পেরেছেন এ-দেশের ক'জন? বাঙালীর হাজার বছরের পুরানো যে একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি রয়েছে, যা নিয়ে দুর্গত বাঙালী জগতের যে-কোনও সুসভ্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে, এ খবর আজকের দুনিয়ার কাছে এমন দরদ দিয়ে কে ঘোষণা বলতে পেরেছেন? 'বাঙালীর ইতিহাস চাই,' বঙ্কিম-চন্দ্রের এই উদাত্ত আহ্বান, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-লেখক দীনেশচন্দ্র যেমন কান পেতে শুনেছেন তেমন করে আর ক'জন শুনতে পেরেছেন? ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার ঋণ গ্রহণ করবার বহু পূর্বেই বাঙালী জাতি এমন একটি সাহিত্য গড়ে তুলেছিল যার গৌরবময় পরিণতি আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে—জগতের কাছে এই তথ্যটি দীনেশচন্দ্র দৃপ্ত কণ্ঠে প্রথম ঘোষণা করেন।

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেছিল—সে নবদ্বীপে।" একথা সর্বসংশয়চ্ছেদী প্রত্যয়ের ভাষায় কোন্ গুরু দীনেশচন্দ্রের মতো একালে ব্যক্ত করতে পেরেছেন? এঁর আজিকার সুচিন্তিত অভিভাষণের সবটুকু নিশ্চয়ই আপনারা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে শুনবেন। আমি শুধু শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়ের ও আপনাদের অনুমতি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দপ্তরের" স্বল্পাংশ আপনাদের শুনাব। অতঃপর দেশবন্ধু আবৃত্তি করলেন "কমলাকান্তের দুর্গোৎসব"

থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশ। নির্ভুল অস্খলিত সামগ্রিক আবৃত্তি। তেমন অনুভব-দীপ্ত জীবনময় আবৃত্তি জীবনে শুনিনি, বোধ হয় শুনব না।

"দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে। আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত অকূল অন্ধকারে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোতোমধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, আবার নিভিতেছে, আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল। নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা মা' করিয়া ডাকিতেছি।

* * * *

"দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না। সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল। তখন যুক্তকরে সজল নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব. সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি, দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃ-বৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব, উঠ মা, একা রোদন করিতেছি। কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ, উঠ মা, বঙ্গজননী!"

দেশবন্ধুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত এই সঙ্কল্পবাণী নিশ্চয়ই পরলোকবাসী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমের অমর আত্মার পরিতৃপ্তি বিধান করেছিল। এ-মন্ত্রের পরম সার্থকতা দেশবন্ধুর নিজ জীবন। প্রতিটি শব্দ তাঁর কণ্ঠে, তাঁর অনুভবে এবং তাঁর আচরণে যেন মূর্তি ধরেছিল। তাঁর জন্যেই কি রচিত হয়েছিল এই মন্ত্র? আবৃত্তিকার এবং আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রোতৃমণ্ডলীর গলদশ্রুধারার মধ্যে আবৃত্তি শেষ হ'ল। এই মন্ত্র যাঁর হৃদয়কন্দর হ'তে সমুৎসারিত হয়েছিল তাঁর নয়নে একদিন এই অনুভব নিশ্চয়ই অশ্রুর প্লাবন বহিয়েছিল। তাঁর আনন্দমঠের জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী সন্তানও 'শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী'তে 'ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী' মাটির মা'-টিকে স্মরণ করে চোখের জলে ভেসেছিলেন, আর গেয়েছিলেন আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের সেই জাগরী-গাথা 'বন্দে মাতরম্'। বিষয়ী মহেন্দ্র সিংহের অন্তরে বিস্ময় জেগেছিল, সন্ন্যাসীর কেন চোখে জল!

প্রায় পাঁচশো বছর পূর্বে এক হিরণ্যদ্যুতি সন্ন্যাসকৃৎ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসন্তানের

কণ্ঠে আটটি শ্লোক উচ্চারিত হয়ে 'শিক্ষাষ্টক' নামে আখ্যাত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি শ্লোক

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে মে ভবিষ্যতি॥"

এই প্রার্থনাটি তাঁর শ্রীমুখপদ্ম হতে উৎসারিত হয়েছিল ভগবদনুভূতির অভিব্যক্তিরূপে, কৃষ্ণনাম আশ্রয় করে। এই মানুষটিকে ভালবেসে এবং তাঁর আচরিত ভালবাসার ধর্ম অঙ্গীকার করে বাঙালী বহু দুর্যোগ কাটিয়ে তাঁর সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে রয়েছে। আজ হতে শতাব্দীকাল পূর্বে এমনই মধুর হয়ে ফুটেছিল দেশমাতৃকার নাম ও মহিমার মন্ত্ররূপ আর একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ সন্তানের মুখে। সেই মাতৃনাম-মন্ত্র সজীব হয়ে দেখা দিয়েছিল আমাদের কালের দুইটি বঙ্গসন্তানের জীবনে। তাঁদের একজন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অপরজন বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিবৃত্তকার দীনেশচন্দ্র সেন। একজন 'বহুবল-ধারিণী' মায়ের 'তারিণী' মূর্তির বোধন করেছিলেন শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে, সর্বস্ব সমর্পণ করে। আর একজন 'সুমধুর-ভাষিণী' মায়ের বাণীমাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করে আত্মহারা হয়ে স্বজাতিকে সেই মাধুর্য আস্বাদন করিয়েছিলেন। তেমন আত্মহারা আত্মাদর-পরিশূন্য বাঙালী আবার কবে আসবেন এই নিরানন্দ স্বমহিম-ভ্রষ্ট খণ্ডিত বাংলায়?

মহাত্মা গান্ধী

বাগবাজার অমৃতবাজার অফিস থেকে দুঃসংবাদ বেরুল, ভগ্নস্বাস্থ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংএ দেহরক্ষা করেছেন। গভীর শোকে বেদনায় সমস্ত জাতি মুহ্যমান হয়ে পড়ল। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি দেশের জন্য সর্বস্ব দিয়ে দরিদ্র সাজে প্রায় অচিকিৎসায় রোগভোগ করে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। সর্বত্যাগী প্রিয়তম দেশনায়ককে বিদায়-অভিনন্দন জানালেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ,

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

পরদিন সকালে রেলযোগে দেশবন্ধুর মৃতদেহ কোলকাতায় পৌঁছুবে এবং কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে সৎকার হবে। ঠিক একটি বছর আগে এমন-এক দিনে পাটনা শহর থেকে এসে পৌঁছেছিল শিক্ষাকর্ণধার স্তর আশুতোষের শবদেহ। আঘাতের পর আঘাত বাংলাদেশের উপর নেমে এল।

সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে বিশাল স্তব্ধ শোকাহত জনতা শান্তভাবে অপেক্ষা করছে শিয়ালদহ স্টেশনে। নরনারী বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই আছেন তাতে—হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-পার্শী খ্রীষ্টান সকল প্রদেশের অধিবাসী। প্রায় আটটার সময়ে শিয়ালদহ উত্তর স্টেশনে আস্তে আস্তে গাড়ী এসে ঢুকল। একখানি গাড়ীর প্রতি সহস্র সহস্র চক্ষুর দৃষ্টি পতিত হ'ল। সেই গাড়ীতেই বিনিষ্ক্রান্ত মহৎ প্রাণের পরিত্যক্ত পাঞ্চভৌতিক আধারটি রক্ষিত। যে ক'জন সঙ্গী প্রিয়তম জনসেবকের দেহ সযত্নে আগলিয়ে আসছিলেন তাঁদের পুরোভাগে দেখা গেল কটিবাস-পরা স্থিতধী মহামানব মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি। চাঁদপুর থেকে খুলনায় আসবার পথে দুঃসংবাদ পেয়ে খুলনার অনুষ্ঠান বাতিল করে কোলকাতা-অভিমুখে ছুটে আসছেন ভারতীয় গণচেতনার অগ্রদূত। বারাকপুর স্টেশন থেকে উঠেছেন তিনি ঐ গাড়ীতে।

তারপর ধীরে ধীরে শববাহী পুষ্পসমাকীর্ণ আধারে গাড়ী হতে নামিয়ে আনা হল চিত্তরঞ্জনের পার্থিব অবশেষ। বিশাল জনসমুদ্রে অস্ফুট শোকপ্রকাশ-জনিত তরঙ্গোৎক্ষেপ হ'ল। শববহন করবার জন্যে যাঁরা এগিয়ে এলেন আর্দ্রগাত্রে নগ্নপদে তাঁদের মধ্যে ছিলেন, যতদূর মনে আছে, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জি) প্রমুখ দেশসেবক। নির্ধারিত পথ অতিবাহন করে শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে কালীঘাটের অদূরে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের দিকে অগ্রসর হ'ল। চল্লিশ বছর আগেকার কোলকাতা—সেদিনকার কেওড়াতলা শ্মশান এখানকার পরিবেশে মনে করা কষ্টকর। কাঁচা মেটে রাস্তা, যেন চোখের জলে আর্দ্র শীতল মাটি, বাঁশঝাড়, দূরে-দূরে কাঁচা ও পাকা ছোট ছোট বাড়ী।

শবদেহ শ্মশানে আনীত হওয়ার বহু পূর্বে মহাত্মা গান্ধী অন্য পথ ধরে কেওড়াতলায় এসে গিয়েছেন, সমস্ত ব্যবস্থা পরিদর্শন ও নিজহাতে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে। আমরা ও জনতার একাংশ কি মনে করে মন্থরগামী শোভাযাত্রা ছেড়ে অনেক আগে শ্মশানক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছি। সেখানেও প্রতীক্ষমাণ

বিরাট জনতা। এই জনতার মধ্যে বহু দুঃস্থ ভদ্রঘরের মায়েরা এসেছিলেন যাঁদের প্রত্যেকটি পরিবার এই মহাপ্রাণ দানশৌণ্ডিকের দানে সংসার নির্বাহ করতেন—তাঁদের নয়নে অশ্রুপ্রবাহ, মুখে হাহাকার ও স্বর্গত মহাপুরুষের প্রশস্তি। শ্মশানঘাটে তখন এখনকার মত একটিও মঠ মন্দির ছিল না। আদিগঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁটাগাছের বেড়া-দিয়ে-ঘেরা মহাশ্মশান। একটি বদরীগাছের তলে কখানি বেঞ্চি পেতে রাখা হয়েছে। একখানি বেঞ্চিতে মহাত্মা গান্ধী সমাসীন, যেন 'বিষাদনীহার-পরীত মূর্তি'।

একটি ব্যক্তিগত সৌভাগ্যস্মৃতি মনে পড়ে। শ্মশানে বসে শবদেহের আগমন প্রতীক্ষায় মহাত্মা গান্ধী একটি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখছিলেন দেশবন্ধু-সম্পর্কে যা পরদিন দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত Forward-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধরচনাকালে মহাত্মাজীর মুখের উপর রোদ এসে পড়ছিল। রৌদ্র নিবারণের জন্যে তাঁর মাথায় একটি ছাতি ধরবার সৌভাগ্য আমি অর্জন করে-ছিলাম। মুখ তুলে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, যতক্ষণ আমি লিখি ছাতা ধরতে পার। লেখা শেষ হলে সে-অনুমতি প্রত্যাহৃত হ'ল। সেদিন পর্যায়ক্রমে রোদবৃষ্টি হয়েছিল বারংবার—প্রকৃতির করুণ ক্রন্দন, স্বর্গের দেবতাদের অভিনন্দন পুষ্পবৃষ্টি।

শবদেহ আসতে বেশ দেরি হয়ে গেল। ক্রমবর্ধমান অধীর জনতার চাপে চিতার জন্যে রক্ষিত স্থানটুকুর বেড়া মাঝে মাঝে ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল। শীর্ণদেহধারী স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটি উঠে বারংবার জনতার উদ্দেশে যুক্তকরে মিনতি জানিয়ে বলছিলেন,—যে যেখানে আছেন, প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, পিছনের ব্যক্তির অগ্রসর হবার আগ্রহকে বাধা দিন। যাঁকে ভালবাসেন, ভক্তি করেন, তাঁর সংকারের জন্যে এতটুকু ঠাঁই আপনারা দেবেন না? জনগণের প্রতি প্রযুক্ত জনগণমন-অধিনায়কের সে-ভাষা কি স্পষ্ট, জোরালো ও আন্তরিকতায়-ভরা। অগ্রগামী জনতার ভয়ঙ্কর চাপ সত্যই বারিত হয়েছিল প্রতিবার তাঁর অনুনয়ে। তাঁর পদধূলি গ্রহণ করবার জন্যে করপ্রসারণ করে এগিয়ে আস-ছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রতি সস্নেহ তিরস্কারের ভাষাই বা কি অপরূপ!

শ্মশানে এক সময় খুব চাঞ্চল্য দেখা দিল। শোনা গেল, দেশবন্ধুর সহোদর প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার পি. আর. দাশ) পাটনা থেকে কোলকাতায় সরাসরি শ্মশানঘাটে চলে এসেছেন! শ্মশানের এক প্রান্তে অগ্রজের একমাত্র

পুত্র চিত্তরঞ্জন-ভোম্বলকে বুকে জড়িয়ে ধরে করুণ ক্রন্দনের সে দৃশ্য কি মর্মঘাতী। আলিঙ্গন-বদ্ধ অশ্রুস্নাত সেই পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখে উপস্থিত সকলেরই চোখ ফেটে জল বেরিয়েছিল সে-দিন। শবদেহ শ্মশানে আনীত হবার মুহূর্তে এবং চিতায় অগ্নিসংযোগকালে প্রতিবার জনতার চাপ সবার উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছিল। প্রতিবারই ক্ষীণকায় মানুষটি বেরিয়ে এসে জনতাকে সফলতার সঙ্গে রুখতে পেরেছিলেন। একবার ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন, "যিনি আপনাদের সকলকেই ভালবাসতেন তাঁর পার্থিব দেহ দলিত করে সৎকারে বাধা দেওয়া কি আপনাদের অভিপ্রেত ?"

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতোঽরুণ-পুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিযম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু।"

লোকোত্তর মনুষ্যমহিমায় দেদীপ্যমান কি সুন্দর মানুষ এঁরা দু'জন—একজন অস্তাচলে, অপরজন উদয়াচলে সমারূঢ়। একের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন আর একজন। একজন যেন বিবেকানন্দের দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত ভারতের সেই ভাবী মানুষ, দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী যাঁকে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাঁকে আবাহন করেছিলেন এই বলে, "কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হয়ে তুমিও সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই", আর একজন পুরাণকর্তার কল্পনা-নয়নে প্রতিভাত দয়ালু দধীচি, হৃত স্বর্গের পুনরুদ্ধারের জন্য যিনি নিজের অস্থি দান করেছিলেন ! জীবনে-মরণে এ এক বিস্ময়কর যুগল-মিলন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে এমনই যুগল-মিলনের ফলে উৎসারিত হয়েছিল এক মহতী সমন্বয়ী গাথা যার নাম গীতা। সেই গীতার স্থিতধী তত্ত্ব মূর্ত প্রত্যক্ষ করেছিলাম জাতীয় মহাশোকের এই মহামুহূর্তে,

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনিশ-শো পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। বি. এ. পরীক্ষা উপলক্ষ্যে পরীক্ষক আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহূত আলোচনা-সভায় এসেছি। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রধান পরীক্ষক। পরীক্ষকেরা সবাই প্রবীণ স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক, আমিই শুধু অর্বাচীন অধ্যাপক। জলধর সেন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ঘোষাল, এঁদের নাম মনে আছে। দ্বারভাঙ্গা সৌধের একতলায় ঢুকেই ডাইনের দিকের ঘরটিতে সভা বসেছে। প্রশ্নাবলীর আলোচনা এবং পরীক্ষা-সংক্রান্ত স্মারক নিয়মাবলীর খসড়া রচনা হতে না হতেই কে খবর দিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেদিন স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াতে আসছেন—তাঁর আসবার সময় হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবিভাগের অধ্যাপক-প্রধান এবং রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ হতে তখন দীনেশচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেছেন। উত্তরাধিকার বর্তেছে অধ্যাপক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের উপর। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলার অধ্যাপকের পদ অঙ্গীকার করবার জন্যে সম্মতি দিয়ে কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধিমান্ ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন।

পরীক্ষক-সভায় আমাদের আগ্রহাতিশয্যে প্রধান পরীক্ষক শীঘ্র সভাসমাপন করে আমাদের রবীন্দ্রনাথের ক্লাশে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিলেন। আমরা অনেকেই এসে নব-নির্মিত আশুতোষ-সৌধের দ্বিতীয়তলে পুঁথিশালার উত্তর-পশ্চিমের ঘরটিতে সেই ঐতিহাসিক পাঠনাকক্ষের পিছনের বেঞ্চিতে একটু ঠাঁই নিলাম। স্থানাভাবে কক্ষের বাইরেও বহু শুশ্রূষু শান্তভাবে সমবেত হয়েছিলেন। সেদিন ছাত্রদের প্রার্থনানুসারে শা-জাহান-কবিতা পড়ানো হচ্ছিল। আমরা এই অপূর্ব কবিতার রচয়িতার কণ্ঠে প্রথমে সমগ্র কবিতাটির আবৃত্তি শুনলাম। সে এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা যা মানুষের স্মৃতির ভাণ্ডারে মহার্ঘ সঞ্চয় হয়ে থাকে। তারপরে আলোচনা। দূরাগত স্মৃতির বিশ্লেষণ করে আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারব না, আমাদের সেদিনকার অননুভূতপূর্ব সেই তন্ময়তার মূলে বিদ্যমান ছিল কবির সেইদিনকার ব্যাখ্যান, না ব্যাখ্যাতার অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য-কান্তি, মধুস্রাবী কণ্ঠ, অননুকরণীয় বাচনভঙ্গী, সর্বজয়ী ও সর্বতোভদ্র সৌজন্য

ও সর্বচিত্তহারী সহৃদয়তা। কবির শা-জাহান ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অনুভব হয়েছিল এই: এমন একটি অপরূপ সৃষ্টির ব্যাখ্যা স্রষ্টা নিজে করলে সেই সৃষ্টির সীমাহীন সম্ভাবনা কতকটা যেন ক্ষুণ্ণ ও খণ্ডিত হয়। চিরকালের রসিক ও ভাবুক আস্বাদন করেও এই অমেয় রসভাণ্ডার নিঃশেষ করতে পারবেন না। কবি যেন কেমন অবলীলাক্রমে অনাড়ম্বরভাবে কবিতাটির এক-একটি দিক্ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলেন, যাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি ঠিক হয় নি!

দূর থেকে কবিদর্শনের আর একটি দিনের স্মৃতিও এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করবার লোভ-সংবরণ করা যায় না। পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় দশ বছর আগে উনিশ-শো চব্বিশে পাটনায় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেহরক্ষা করেছেন। বাংলার পুরুষ-শার্দূলের শবদেহ কোলকাতায় এনে সৎকার করা হয়েছিল। শোকাহত জাতির প্রথম শোকসভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সভায় বিজ্ঞাপিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভারম্ভের বহু পূর্বে সমগ্র প্রশস্ত কক্ষটি জনারণ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ভিতরে-বাহিরে দরজায় জানালায় পায়রার মতো লোক ঝুঁকে অথবা ঝুলে বিপজ্জনকভাবে স্থান সংগ্রহ করেছিল। সময় চারটা—গ্রীষ্মের শেষ। মেঘান্তরিত রৌদ্রের অসহনীয় উত্তাপ। জনাকীর্ণ ঘরটিতে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করতেও লোকে কষ্ট অনুভব করেছিল।

নির্ধারিত সময়ে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন কবি—ক্ষৌমবাস পরিধানে দেবদুর্লভ শুভ্রকান্তি। আমাদের সেই প্রথম দর্শন। আসন গ্রহণ করেই কবি ক্ষিপ্রভাবে কক্ষের অবস্থাটি দেখে নিলেন—সমবেত বিপুল জনমণ্ডলীর অসহনীয় গ্রীষ্মজনিত শারীরিক কষ্ট কবি যেন সমগ্র হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন। কি করবেন, যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। এমন সময় বাইরে ঘন ঘন "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি শ্রুত হ'ল। পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন আর দুটি মানুষ—অগ্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পশ্চাতে শিষ্য সুভাষচন্দ্র।

কবিকে অভিবাদন করে তাঁরা আসন গ্রহণ করলেন। কবি উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর দেহমনের ক্লেশাধিক্য সকলের অনুভবের বিষয় হয়ে উঠল। তিনি স্বকীয় সুদৃঢ় অথচ সুমধুর অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, "চিত্তবাবু, চিত্তবাবু, আমি পারছিনে। সবার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। অভিভাষণ আমি লিখে এনেছি। কেউ দয়া

করে পড়ে দেবেন। আপনি আমার আজকার কাজটুকু করুন, দয়া করে এই সভায় আপনিই সভাপতিত্ব করুন।" এই বলে বিশাল জনতার উদ্দেশে যুক্ত-করে নমস্কার জানিয়ে বেদনা নিয়ে কবি সভাকক্ষ হতে বিনিষ্ক্রান্ত হলেন।

কবি-সাক্ষাৎকারের এই মাহেন্দ্রমুহূর্তে দু'বারের একটিবারও ব্যক্তিগত সম্পর্ক তো দূরের কথা, নিকট সান্নিধ্য ও সংস্পর্শলাভেরও কোন সুযোগ মেলে নি। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চিরস্মরণীয় একটি অধ্যায়ের এক কোণে স্থান পেয়েও এই যুগপাবন ব্যক্তিপুরুষের সামীপ্যে আসবার শ্লাঘনীয় সৌভাগ্য সুদুর্লভ রয়ে গেল জীবনে। এই আফশোষ যতটুকু মিটেছিল আমার অধ্যাপনা-পর্বে সেই কাহিনীটিই এখন বিবৃত করব। আমার সেই অভিজ্ঞতা পদকর্তা গোবিন্দ-দাসের ভাষায়, "দারিদ পাওল যেন ঘটভরা হেম।"

চাটগাঁয় সরকারি কলেজে অধ্যাপনার কাজ বেশ-কিছুদিন করে চলেছি। আমার একটি মেধাবী ছাত্র মাঝে-মাঝে নিজেদের মোটর-গাড়ীতে করে আমার বাসায় আসত। সাহিত্যের অনুরাগী ছাত্র, আমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে, জিজ্ঞাসাবাদ করে, তৃপ্ত হয়ে চলে যেত। একদিন সসংকোচে বলল, সে একখানি নাটক লিখছে। লেখাটা আমাকে দেখে দিতে হবে। দু'একদিন বাদে তাঁর পিতৃদেবও পুত্রের সঙ্গে আমার বাড়ীতে এলেন। স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সাহিত্যিক মতিগতিসম্পন্ন রুচিমান্ ব্যক্তি। পুত্রের কাছে আমার কথা শুনে থাকেন, বললেন। ছাত্রেরা নাকি আমাকে ভালবাসে, সুতরাং তাদের দাবি আমাকে মানতে হবে। আমার এই ছাত্রের প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াস এই নাট্যকৃতি—আমাকে ভালো করে দেখে প্রয়োজনমতো শুধরে দিতে হবে। ছাত্রের এবং তস্য পিতার এই দাবী আমার পক্ষে লঙ্ঘন করা সহজ নয়, আমি সম্মত হলাম।

নাটকের নাম মৈত্রেয়ী। ব্রহ্মবাদী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর ব্রহ্মবাদিনী সহধর্মিণী মৈত্রেয়ী। "একাঃ সদ্যোবধ্বঃ অন্যাঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ"—এই শ্রুতি অনুসারে কেউ বা ছিলেন সদ্যোবধূ, আবার কেউ বা ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। কিন্তু মৈত্রেয়ী ছিলেন একাধারে বধূব্রত-চারিণী ও ব্রহ্মবাদিনী। "কিমহং তেন কুর্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্যাম্ —শাশ্বত মানবের শ্রেয়োনের্দেশিকা এই মহাবাণী এই মহীয়সীর শ্রেষ্ঠ দান। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর সংযোগ-মিলন, দাম্পত্যজীবন ও সাধনবার্তা এইসব-কিছু নিয়ে নাটকের নাট্যবস্তু। রচনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

আমি লিখিত অংশ দেখে প্রয়োজনমতো মন্তব্যপ্রকাশ ও সংশোধন করে দিতাম। রচনা শেষ হ'ল। স্থানীয় প্রবর্তক-সংঘের ছাপাখানায় নাটকপ্রকাশের ব্যবস্থা হ'ল। বইখানি যাতে প্রমাদরহিত ও নির্ভুল ছাপা হয় এ-জন্যে পিতাপুত্রের আগ্রহাতিশয্যে আমি সমস্ত প্রুফ সংশোধন করে দিতে লাগলাম।

মুদ্রণ শেষ হয়ে এল। তখন অনুরুদ্ধ হ'লাম, নাটকের একটি ভূমিকা লিখে দিতে হবে। এই অনুরোধটিও উপেক্ষা করা গেলনা। নাতিক্ষুদ্র একটি ভূমিকাও লেখা হ'ল। এর পরে আরও একটি দুরূহ শ্রমসাধ্য কাজ আমাকে করবার জন্যে পিতাপুত্র জিদ ধরলেন। কবি, সাহিত্যরথী ও স্বনামখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁদের এক একখণ্ড মৈত্রেয়ী উপহার দিয়ে নাট্যকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের মতামত সংগ্রহ করতে হবে। উপরোধে এই ঢেঁকিটিও গিলতে হ'ল। প্রায় শতাধিক চিঠি লিখতে হ'ল। ব্যক্তিগত পরিচয় যাঁদের সঙ্গে ছিল তাঁদের কাছে একরকমের চিঠি। অপরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আর একরকমের চিঠি। আমার চিঠি ও অনুরোধে জ্বালাতন হয়েছিলেন এমন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও অধ্যাপক অনেকে এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, ঘটনাটি স্মরণ করতে তাঁরা হয়ত কৌতুকবোধ করবেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই সূত্রে মনে পড়ে—তাঁরা দীর্ঘজীবী হোন। স্বর্গতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম মনে পড়ে।

অনেকেই বইখানি পড়ে অথবা পাতা উলটিয়ে দু'একটি কথা লিখে জানিয়েছিলেন। কেউ বা সময়াভাববশতঃ পড়লেন না অথবা পড়লেও কোনও উত্তর দিলেন না। কোন কোন স্পষ্টবাদী যা লিখলেন তার মর্ম এই, "রঘুরপি কাব্যম্ তদপি চ পাঠ্যম্"। বালকের লেখা নাটক—তার অধ্যাপকের পরিচায়িত ও প্রশংসিত নাটক—এ-ও পড়তে হবে এবং সে-সম্বন্ধে লিখিত মতামত ব্যক্ত করতে হবে! এমন আশা কি করে পোষণ করতে পেরেছি আমি"—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার স্পষ্টই মনে আছে, শতাবধি চিঠি লিখে সর্বপ্রথম জবাব পেয়েছিলাম যাঁর কাছ থেকে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিঠির তারিখ দিয়ে হিসেব করে দেখা গেল, চিঠি পাওয়ার তৃতীয় দিবসেই জবাব দিয়েছেন কবি। কবি তখন রোগশয্যায়। একটি কঠিন অস্ত্রোপচার

হয়েছিল তার অঙ্গে কিছুদিন আগে। পূর্ণ বিশ্রাম ও কর্মবিরতি ছিল চিকিৎসক-দিগের তখনকার নির্দেশ। সেই অবস্থাতেও তৃতীয় দিনের মধ্যে কবি আগাগোড়া বইখানি পড়েছেন। শুধু তাই নয়, এই অর্বাচীনের ভূমিকাটিও সব পড়েছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে নিজহাতে তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভাষায় ও ভঙ্গিতে একখানি সুন্দর চিঠি লিখে তরুণ নাট্যকারকে আশীর্বাদ অভিনন্দন জানিয়েছেন। চিঠিখানি আমাকে লিখিত হ'লেও নাট্যকার সেখানি গ্রহণ করে সযত্নে রক্ষা করেছেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতীয় জীবনদর্শন এবং নারীমহিমার স্মারক এমন একটি বিষয় নিয়ে এমন সুন্দর নাটক লিখেছেন বলে তরুণ নাট্যকারকে কবি প্রশংসা ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। ভূমিকায় আমি দু'টি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। একটি TECHNIQUE-এর বদলে 'প্রয়োগ-বিজ্ঞান', অপরটি ROMANCE ও ROMANTIC এর বদলে যথাক্রমে 'রোচিষ্ণুতা' ও 'রোচিষ্ণু'। প্রথম প্রয়োগটি কালিদাসের—"আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"। 'আঙ্গিক'-কথাটি যতদূর মনে হয়, তখনও চালু হয়নি। দ্বিতীয় প্রয়োগটি একটি বৈদিক মন্ত্রে পেয়েছিলাম, "সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ"—বিবাহকালে মিলিতভাবে, দম্পতীকে এই মন্ত্রটি পড়তে হয়। আমার এই দুটি প্রয়োগ কবির তীক্ষ্ণ ও সপ্রশ্রয় দৃষ্টি এড়ায়নি। চিঠিতে অন্য কথার সঙ্গে তিনি এ-সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তার মর্ম এমন হবে। "ইংরেজি Romance শব্দটির দ্যোতনা ব্যাপক ও গভীর। এর একটি দিক্‌কে অন্ততঃ আমার আবিষ্কৃত এই বৈদিক প্রয়োগটির সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। এজন্যে কবি আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে কবি আর একটি কথাও লিখেছিলেন। রোচিষ্ণু প্রয়োগটি অর্থবহ ও সম্ভাবনাপূর্ণ হলেও এ-যুগের রুচিকর হবে কিনা সন্দেহ। যুগপ্রবণতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কত অভ্রান্ত ও বাস্তবানুগ! সত্যই আমার আবিষ্কৃত 'রোচিষ্ণু' চালু হ'লনা। রোমান্টিক সাহিত্যের প্রবীণ বোদ্ধা সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রয়োগটির আংশিক অর্থবহতার পক্ষে অনুকূল মত প্রকাশ করে আমাকে একখানি বিস্তৃত চিঠি দিয়াছিলেন, যা আমাদের প্রবর্তিত ও চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'পার্বণী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'মৈত্রেয়ী'-রচয়িতা উত্তরকালে দর্শনশাস্ত্রের এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে

উত্তীর্ণ হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর পিতৃদেব পরলোকে। বিশ্বকবিও ইহজীবন থেকে চিরজীবনে অন্তর্ধান করেছেন। এঁদের পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্যস্থতার স্মৃতি আমার অন্তর্লোকের একটি অনুভবকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। সেই অনুভবটি এই, কবি-মহিমা ও মনুষ্যমহিমার মাঝখানের পর্দাটি অতি সূক্ষ্ম—কবির আড়ালে রয়েছেন মানুষ। মহাকবির আড়ালে মহৎ প্রাণ। কবি রবীন্দ্রনাথ যত বড়ো, মানুষ রবীন্দ্রনাথও তত বড়ো। অথবা, তাঁরই ভাষায়,

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

এ-কালেব যে মনীষী ছাত্রহিতৈষী দেশহিতব্রত শিক্ষক, যে আত্মসুখ-বিমুখ আত্মাদর-পরিশূন্য চিরকুমার বিজ্ঞানতপস্বী তাঁর স্বচ্ছ জীবন ও আচরণের মধ্য দিয়ে 'আচার্য'-শব্দের অনন্যসাধারণ সার্থকতা-বিধান করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সংযোগ জ্যামিতির স্পর্শকের মত বিন্দুমেয় হলেও সে অপরিসীম-সৌভাগ্যস্মৃতি জীবনের অমূল্য পাথেয় হয়ে রয়েছে। কত মহৎ জীবনের উদ্বোধন হয়েছে সে-স্পর্শে সে-কথা দেশবাসীর অবিদিত নেই। কিন্তু আমাদের মত কত সাধারণ মানুষ তাঁর অপার মনুষ্যমহিমার স্বল্পাংশও উপলব্ধি করতে পেরে ধন্য হয়েছে সেকথা সবার গোচর করলে অন্যায় হবে না, আশা করি।

শতাব্দীর প্রথম দশকে, শৈশবে একবার খুলনা থেকে সাতক্ষীরাগামী স্টীমারে ভ্রমণের উপলক্ষ্য হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে ডেকের সামনের দিকে বহুযাত্রি-পরিবেষ্টিত একটি অপেক্ষাকৃত শীর্ণকায় মানুষকে দেখে প্রায় স্টীমারশুদ্ধ সমস্ত লোক একসঙ্গে কোলাহল করে উঠল, পি. সি. রায় যাচ্ছেন, আমাদের পি. সি. রায়, অর্থাৎ খুলনার পি. সি. রায়—বিশ্ববিশ্রুত হয়েও একান্তভাবে খুলনাবাসী আপামর-সাধারণের নিতান্ত আপনার জন। আমাদের সঙ্গে সুন্দরবন-অঞ্চলের এক ভূ-স্বামী ছিলেন। তিনি তেমন লেখাপড়া না জানায়

পি. সি. রায়ের মহত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, অথচ তাঁর প্রতি স্বজনবুদ্ধিতে কারো চেয়ে তিনি ন্যূন ছিলেন না। তিনিই আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, কত বড়ো মানুষ পি. সি. রায়। তথ্যবিশুদ্ধির অভাব-সত্ত্বেও খবরগুলি মহামানবের মহিমায় জীবনের প্রথম পর্বে আমাকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের' রাড়ুলির হরিশ রায়ের ছেলে ইনি, বড়ো বিদ্বান্, বিলেত ফেরৎ—বিয়ে করেননি। কোলকাতায় বড়ো কলেজের প্রফেসার। আবার খুব বড়ো ডাক্তার (?)। অনেক রকম আরক্ তৈরি করেছেন. যেমন বাসক সিরাপ (বলা বাহুল্য, বেঙ্গল কেমিক্যালের সিরাপ-অব-বাসক)। গরিব-দুঃখীর পরে বড়ো দয়া। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছেন। পাশের সব গ্রামে সবার বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে খোঁজখবর নিয়ে বেড়াবেন, চিড়ে-মুড়ি নারকেল খাবেন বিলেত-ফেরৎ হয়েও। এমন কত কিছু শ্রদ্ধা ও কল্পনা দিয়ে তিনি বলে গেলেন। আমরাও শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে শুনে গেলাম।

উনিশশো-আঠারো সালে দৌলতপুর কলেজের ছাত্রাবাসে থেকে আই. এ. পড়ি। ক্লাসে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মাঝে মাঝে প্রাণ খুলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মহিমা কীর্তন করতেন। তাঁর সদ্যঃ-প্রকাশিত যশোহর-খুলনার ইতিহাসের উৎসর্গ-পত্রেও বোধ হয় তাঁর সম্বন্ধে সারগর্ভ অনেক কথাই বলা হয়েছিল। একদিন খবর পেলাম, বাগেরহাট শিক্ষক-সম্মিলনীর অধিবেশনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বিচারপতি স্তর আশুতোষ চৌধুরী আসছেন। খুলনা-বাগেরহাট লাইট রেলওয়ে সদ্যঃ নির্মিত হয়েছে। এই দুই দেশবরেণ্য যাত্রীকে নিয়ে গাড়ী বোধ হয় প্রথম যাত্রা শুরু করবে। ক'জন উৎসাহী বন্ধুকে নিয়ে ছুটলাম খুলনার পূবদিকের দক্ষিণবাহিনী রূপশা গাং পার হয়ে রূপশা ইস্ট রেলস্টেশনের দিকে। স্টেশনে হাজির হয়ে হতাশার সঙ্গে দেখলাম, গাড়ী ছেড়ে গিয়েছে—দেখা যায়, অদূরে অপেক্ষাকৃত মন্থরগামী ছোট গাড়ী চলছে। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন, "দৌড়াও, ভাইডিরা, আস্তে চলবে গাড়ী। দৌড়ে ধরতে পারবে।" প্রায় দু'মাইল দৌড়ে ছুটলাম গাড়ীর পিছন পিছন। ধানের ক্ষেত, ঢেঁকিঘরের কানাচ, পানাপুকুরের পাড়, পাঠশালার ধার দিয়ে বেদম ছুটেও ধরি-ধরি করে গাড়ী ধরতে পারলাম না। শেষে আলাইপুর পর্যন্ত গিয়ে এক ছোট ভাঙা জল-ওঠা নৌকা অল্প-পয়সায় ভাড়া করে যাত্রাপুরের পথে ঘুরে

গিয়ে প্রায় চার ঘণ্টায় গাড়ীর কিছু-কম-একঘণ্টার পথ অতিক্রম করে বাগেরহাটে পৌঁছি।

সভা বসবার কিছু আগে স্থানীয় ডাক-বাংলায় দেখতে গেলাম দেশবিশ্রুত মহামান্য দুই অতিথিকে। অতি সৌম্যদর্শন সুপুরুষ স্যর আশুতোষকে সেখানে দূর থেকে দেখলাম—সত্যকার আভিজাত্যের যেন মূর্ত বিগ্রহ। শুনলাম, পি. সি. রায় উঠেছেন বাসাবাড়ীর নাগেদের বাড়ীতে। সভাপ্রাঙ্গণে ছুটে পি. সি. রায়কে এইবার ধরে দ্বিতীয়বার দেখলাম। সভারম্ভের আগেই এসেছেন। চারিদিকে স্থানীয় লোকেরা ঘিরে রয়েছেন। সবার সঙ্গে অনর্গল জোরে কথা বলে যাচ্ছেন, খাশ খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলের উচ্চারণ তাঁর কথাবার্তায়। সভার উদ্বোধন করলেন স্থানীয় জমিদারের গুরুদেব। ভদ্রলোকের মিতভাষণটি মনে আছে, "কোলকাতা থেকে বাবুরা এয়েচেন্। বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী এয়েচেন্—আমাদের পি. সি. রায় এয়েছেন্। সুপ্রভাত—সুপ্রভাত—সুপ্রভাত।"

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র একটি প্রাণস্পর্শী ভাষণের মধ্য দিয়ে স্থানীয় ঐতিহ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ কথা শুনালেন। সভাপতি স্যর আশুতোষের সারগর্ভ ভাষণটিও অতি উপাদেয় হয়েছিল। সর্বশেষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাষণ। সামনের দিকে ঝুঁকে দুলে-দুলে জোর দিয়ে তিনি বলতেন, অত বড়ো বিশ্ববিশ্রুত মনীষী বিজ্ঞানী খুলনাবাসীর যে কতো আপনার জন তা সে-দিন বুঝলাম। CHARITY BEGINS AT HOME—ইংরেজি প্রবাদটির প্রকৃত অর্থ সে-দিন হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। আজ আমরা জন্ম থেকেই 'কন্টিনেণ্টাল' বা বিশ্ববাসী হয়ে বসি। বাঙালীয়ানা ও ভারতীয়ত্ব নাকি সংকীর্ণতা। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' আমরা এইভাবে বুঝে থাকি। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র সত্যকার বিশ্বভাবে ভাবিত ছিলেন, অথচ মনেপ্রাণে ছিলেন একই সঙ্গে তুল্যরূপে বাঙ্গালী, ভারতীয় ও খুলনাবাসী। তাঁর বক্তৃতায় খুলনাবাসীর প্রতি দরদ যেন প্রতি কথায় উপচে পড়ছিল। বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেন, "পুনর্জন্ম আছে কিনা আমি জানিনে। যদি পুনর্জন্ম থাকে আমি যেন এবার মরে গিয়ে আবার খুলনায় জন্মগ্রহণ করি আর খুলনার মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করতে পারি।" সেই সভাতেই বাগেরহাট কলেজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত তিনি করে এলেন, খুলনার শিক্ষাসমস্যার সমাধানের জন্য। এর আগে ব্রজলাল

শাস্ত্রীর কীর্তিস্তম্ভ দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিই ছিল তদঞ্চলের একমাত্র উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান।

দৌলতপুর কলেজ থেকে আই. এ পরীক্ষা দিয়ে কোলকাতায় বি. এ. পড়বার ব্যবস্থার জন্য অধ্যাপকদের সুপারিশ-চিঠি নিয়ে কোলকাতায় যাই। তার মধ্যে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে লিখিত একখানি সুপারিশ-চিঠি ছিল। আচার্যের স্বল্প আয়ের বহুলাংশ ব্যয়িত হ'ত অর্থাভাব-ক্লিষ্ট মেধাবী ছাত্রদের মাসোয়ারা দেবার জন্যে। দু'দিন চেষ্টা করেও বহুলোকের ভিড় ও বাধা ঠেলে আপার সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজে আচার্য রায়ের কাছে যেতে পারলাম না। তৃতীয়দিন রবিবারে প্রায় বারোটার সময় বিজ্ঞান কলেজের দরজায় যেতেই দেখলাম, একলা বেরিয়ে আসছেন হন্‌হন্ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। গায়ে ময়লা টুইলের শার্ট, হাতে এবং মুখের কোন-কোন স্থানে কালির দাগ। রবিবারেও মনে হ'ল, প্রেক্ষাগার থেকে বেরিয়ে আসছেন, অ-স্নাত অপরিষ্কৃত বেশবাস নিয়ে। প্রণাম করে পথেই চিঠিখানি দিলাম। সবটাই পড়ে আমার দুই-কাঁধে দু'খানি হাত রেখে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "সতীশ পাঠিয়েছে তোমাকে আমার কাছে। তুমি দৌলতপুর কলেজের ফার্স্ট বয়—স্কলারশিপ পাবার আশা আছে। কিসে অনার্স নিয়ে পড়বে?" আমি বললাম, সংস্কৃতে। "খেতে পাবে না যে! কৈ, বামুন, মাথায় তো টিকি নেই। পৈতে আছে নিশ্চয়ই।" এই ব'লে মারলেন এক ঘুঁসি। পরে পকেট থেকে একটি ছোট পেন্সিল বের করে সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের লেখা সেই চিঠিখানির উপরে বাঁ-দিকে লিখলেন, My dear Satis (এবার অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক) The letter will speak for itself. The bearer of this note *hailing from my part of the country,* is the best of the students who appeared from Daulatpur College at the last I. A. Examination. He has every chance of securing a Govt. Scholarship. Please see what you can do to admit him tuition-free into the English Honours Class of your College." আমাকে বললেন, "সতীশ লিখেছে তুমি সংস্কৃত ও ইংরেজী দুই বিষয়েই ভালো। যাও ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে সিটি কলেজে পড়বে।" অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায় আচার্যদেবের চিঠির

পূর্ণমর্যাদা দিয়ে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সিটি কলেজে পড়া হ'ল না। ঘটনাচক্রে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে ভর্তি হ'লাম। অবশ্য মাঝে মাঝে যেতাম আচার্যের কাছে, তিনি আমাকে মনে রেখেছিলেন। ভালো কথা, সেদিন পথে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে সুপারিশ লিখে দিয়েই আচার্য তাঁর অপূর্ব সরলতার সঙ্গে আত্মীয়বোধে আমাকে বললেন, "তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে হচ্ছে, পাশের বাড়ীতে। নিমন্ত্রণ আছে কিনা। আজ ওখানে নাইব ও খাব। ভালো খাব আজ।" পাশের বাড়ীতে তাঁর বিশ্ববরেণ্য বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁকে সেদিন খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র তখন জীবিত। অধুনাতন ভারতের দিগ্‌বিজয়ী বিজ্ঞানি-সঙ্ঘের এই পিতৃদ্বয় তখন পাশাপাশি ছিলেন। একজন গৃহী, অপর জীবন্মুক্ত। বসু-বিজ্ঞান মন্দির ও সায়েন্স কলেজ পাশাপাশি।

এর পরের বছর উনিশশো-কুড়িতে দেখা দিল খুলনায় দারুণ দুর্ভিক্ষ। বিজ্ঞান কলেজের সামনে স্তূপীকৃত হ'ত, নোতুন–পুরানো কাপড়ের বড় বড় গাঁইট। অনাহারক্লিষ্ট খুলনাবাসীর দুর্দিনে ভিখারী সাজতে দেখেছি এই বিজ্ঞান-তপস্বী মূর্তিমান্ শিবকে। পূজাবকাশের সময় আচার্য্য রায়ের রাড়ুলি পল্লীর পার্শ্ববর্তী খেশরা-তেঘরি প্রভৃতি গ্রামে জনৈক আত্মীয়ের বাড়ীতে যেতে হয়েছিল। রাড়ুলিতে আচার্য-দর্শনে গিয়ে দেখলাম, নিজের হাতে চাউল বিতরণ করছেন, স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ দিচ্ছেন নানা কাজের। সেই ফাঁকে আমাদের খোঁজখবর নিলেন, কিছু খাইয়ে আমাদের অঞ্চলের লোকের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিদায় দিলেন সেদিন।

চাটগাঁ কলেজে চাকরি করি। বিজ্ঞান কলেজে দেখা করতে গেলাম। বেশ কিছুদিন পরে দেখা। ভাবলাম, আমাকে হয়ত মনে নেই। তাই পরিচয় দিতে প্রয়াসী হ'লাম। সামনের টেবিলে একখানি 'Modern Review' ছিল। বললেন, এই যে এখনই 'Calcutta Review'তে তোমার লেখা গবেষণা-প্রবন্ধের (The Manasa-cult and its Literary Expression) উপর রামানন্দবাবুর লেখা 'Indian Periodicalsএর টিপ্পনী পড়ছিলাম। তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লেখা শেক্‌সপীয়রের উপর ইংরেজি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে 'Calcutta Review' পত্রিকায় বেরুত। আশ্চর্য মানুষ, অদ্ভুত প্রতিভা!

এ'র কিছু আগের আর একটি ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বঙ্গ বিভাগে

অধ্যাপনা করি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন কোন কার্য ব্যপদেশে। আছেন পুত্রাধিক প্রিয় ছাত্র ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে। ডাঃ ঘোষ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ও ঢাকা হলের প্রভোস্ট। উনিশ শো-সাতাশের ঘটনা। সংস্কৃত-বঙ্গ বিভাগের অধ্যাপক-প্রধান ডাঃ সুশীলকুমার দে'র একটি প্রবন্ধ পড়বার কথা ঢাকা হলে, বাংলা নাটকের গোড়ার কথা সম্বন্ধে। সভাপতি হ'লেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ডাঃ দে'র এই বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রবন্ধরচনায় আমার কিঞ্চিৎ সহযোগিতার কথা প্রবন্ধশেষে ডাঃ দে তখন উল্লেখ করতেন। আচার্য রায় তাঁর ভাষণে বাংলা নাটক সম্বন্ধে অনেক খবর দিলেন, যা আমাদেরও জানার বাইরে। মধুসূদনকে নিয়ে গর্বভরে অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন, আবেগভরে আবৃত্তি করেছিলেন,

"অলীক কু-নাট্য-রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"—ইত্যাদি।

ডাঃ দে'র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, সুশীল আমার ছাত্র এবং নাতি। ও'র কাকা কিরণ (কমিশনার মিঃ কে. সি. দে), ও'র বাবা সতীশ (রায় বাহাদুর ডাঃ সতীশচন্দ্র দে) আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সভা-অন্তে আমাকে বলেছিলেন, "জ্ঞানের বাসায় আছি। কাল সকালে যেও সেখানে। আমার কতকগুলি বাংলা-লেখা জমেছে। ছাপবার জন্যে নানা কাগজে পাঠাতে হবে। তোমরা তো আছ, বাংলার দিগ্‌গজ, কেষ্ট-বিষ্টু। আমার লেখার ব্যাকরণের ভুলগুলি শুধরে দিও।" আমার পূজনীয় শিক্ষক ও সহকর্মী চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি পরদিন অধ্যাপক ঘোষের গৃহে গিয়েছিলাম। সেখানে ওঁর লেখাগুলি পড়ে শুনিয়েছিলেন। কি জোরালো তাঁর বিজ্ঞান এবং ব্যবসায়বাণিজ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ের নিবন্ধগুলি।

চাটগাঁ-কলেজে অধ্যক্ষ অপূর্ব চন্দ মহাশয় কলেজের পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে। উনিশ-শো-বত্রিশে, বোধ হয়। প্রফুল্ল-জয়ন্তী ও শরৎবন্দনার একটি সংখ্যা বের করি। তাতে বাইরের নানা মনীষীর লেখা সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হয়েছিল। চট্টগ্রামের ছাত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন উৎসাহী ছাত্রকর্মী এবং ছাত্র-সংসদের উপসভাপতি। দেশবরেণ্য ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের একটি আশীর্বাণীও চিত্তরঞ্জন সংগ্রহ করেছিলেন। আমার একটি

লেখাও তাতে ছিল। পত্রিকাটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে কোলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে দেখা করি। উলটে-পালটে দেখে সেবারও খুঁসি মেরে বলেছিলেন, "আমাকে বড়ো বাড়িয়ে তুলেছ তোমার লেখায়। এত বাড়াবাড়ি ভালো না।" এই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা।

খুলনাবাসীরা আচার্যদেবের শতবার্ষিকী-সভার অনুষ্ঠান করেছিল কোলকাতায় মহাজাতি-সদনে। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতিত্ব করেছিলেন, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ মহামান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। খুলনাবাসী বিচারপতি মিত্রের উদ্যোগে একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। এতে আমারও আচার্যদেব সম্বন্ধে একটি লেখা ছিল। তাতে নানাকথার মধ্যে আমি লিখেছিলাম, সভাতেও বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, ইংরেজ সরকার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে আই. এ. এস.-পর্যায়ে উন্নীত করেনি। অপেক্ষাকৃত স্বল্প বেতনে তিনি চাকরি করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসরগ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষকের কষ্টোপার্জিত স্বল্প আয়ের বহুলাংশ ছাত্রকল্যাণে এবং 'বহুজনহিতায়' ব্যয় করেও নিজের পক্ষে মিতব্যয়ী মানুষটি টাকা বাঁচিয়ে আদর্শ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলেন, কর্মকুণ্ঠ শ্রমবিমুখ তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মোহগ্রস্ত বাবু বাঙালীকে পথনির্দেশ দেবার জন্যে। চা-পানের কু-অভ্যাসটি দূর করবার জন্যে প্রবন্ধ-পুস্তিকা রচনার সময়ও তিনি গুরুতর কাজের ফাঁকে ফাঁকে করে নিতেন। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় সে-দিন সভায় ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, আচার্যদেবকে খুব কাছে থেকে তিনি দেখেছেন। শেষরাতে উঠে আচার্যদেব অতি প্রত্যূষে লাল কড়া-চা দুধ ছাড়াই খেতেন। তথ্যটি আমি জানতাম না, কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য তাতে দুর্বল হয়নি। প্রাচীন ভারতের আচার্য-মহিমা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রে মূর্ত হয়েছিল। আমরা শুনে এসেছি, বলেও থাকি, "সর্বত্র জয়ম্ অন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"। সবার কাছে মানুষ জিততে চায়। কিন্তু হার মানতে চায় পুত্র ও শিষ্যের কাছে। নিঃসন্তান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চেয়েছিলেন তাঁর জ্ঞানজ সন্তানদের কাছে হার মানতে। জ্ঞানচন্দ্র, নীলরতন, সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাথ-প্রমুখ বিশ্ববিজয়ী নব্য ভারতীয় বিজ্ঞানি-সংঘের আচার্য-পিতৃদেব কায়মনোবাক্যে চেয়েছিলেন, তাঁর 'অকৃতকার্য' এঁদের সাধনায় সফল হয়ে উঠবে, তাঁর 'অকথিত বাণী' এঁরাই বিশ্ববাসীকে

শুনাবেন, তাঁর 'অগীত গান' এঁদের জীবনে ও আচরণে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে। আর সেই সঙ্গে শাস্ত্রের আর একটি কথাও মনে পড়ে, "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।" জ্ঞান ও প্রেমের বিপুল তেজে সর্বগ্রাহী সেই প্রাণবহ্নি কি দীপ থেকে দীপান্তরে সঞ্চার করে অনির্বাণ জ্বলবে না?

স্যার নীলরতন সরকার

বাঙালী কর্মজীবনের নানাক্ষেত্রে কৃতিত্বের তুঙ্গস্থানে আরোহণ করেছেন। এই গর্ববুদ্ধি অন্তরে জাগলেই যাঁদের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তাঁদের মধ্যে ডাঃ নীলরতন সরকার নিশ্চয়ই একজন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে অসামান্য অধিকারসম্পন্ন, কৃতী প্রতিভাবান্ এবং হৃদয়বান্ ভারতীয় চিকিৎসকদিগের পুরোবর্তী ছিলেন ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার। শোনা যায়, তাঁর পিতৃদেবের অন্তিম ব্যাধিতে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি, এই দুঃখ নিয়ে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যয়নে ব্রতী হন এবং তাতে ভাবানামুযায়ী সিদ্ধিলাভ করেন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এই মহাবাক্যের তিনি একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ডাঃ নীলরতন সরকারের নাম শুনলে রোগীর মৃত্যুভয় চলে যেত। তিনি রোগীর গৃহে এলে সবাই মনে করতেন, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি এসেছেন। চিকিৎসাবিদ্যা ও ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানে আরোহণ করা ছাড়াও তাঁর প্রতিভার আরও নানা দিক্ ছিল। জাতীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ট্যানারির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি নানাভাবে যুক্ত ছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানের তিনি উপাচার্য হয়েছিলেন। ন্যাশনাল-কাউন্সিল-অব-এডুকেশন-এর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আমরা তখন এম. এ. পড়ি। আমাদের গ্রামের একটি আই. এ. পরীক্ষার্থী ছাত্র পরীক্ষার কিছু আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছাত্রের পিতা রঘুনন্দন গোস্বামী স্বদেশী যুগের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। তাঁর দেশানুরাগের জ্বলন্ত নিদর্শন তাঁর দু'খানি গ্রন্থ 'ছাত্র-জীবন' ও 'শক্তিসঞ্চয়' সেকালে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। গোস্বামি-মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা নানা কারণে অস্বচ্ছল হয়ে পড়েছিল। ছেলেটি প্রথম দিকে ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রীটের সি. আই. টি ব্যারাকের

'এ' ব্লকে ৩১ নং ঘরে ছিল। পরে তাকে নিয়ে এলেন গোস্বামি-মহাশয় রামমোহন লাইব্রেরীর বিপরীতদিকে সি. সি. বিশ্বাসের ওষুধের দোকানের উত্তর দিকে সার্কুলার রোডের একটি ছোট দ্বিতল মেসবাড়ীতে। আমাকে গোস্বামী-মহাশয় বিশেষ স্নেহ করতেন ও আমার উপর দাবি রাখতেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় অসুখের মধ্যেও রোজ রোগশয্যাশায়ী ছেলেটিকে আমি ইংরেজী সংস্কৃত ও লজিক পড়িয়ে শুনাতাম—যাতে রোগশয্যায় থেকেও ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাটি দিতে পারে, একটি বছর মারা না যায়। সুকিয়া স্ট্রীটবাসী আমার হিতৈষী বন্ধু হৃদয়বান্ সুচিকিৎসক ডাঃ জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকে বিনা অর্থগ্রহণে ছেলেটিকে চিকিৎসা করে যেতে লাগলেন।

জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না—কাশি বেড়েই চলল। জ্যোতির্ময়বাবুই দয়া করে ক্ষয়রোগের বিশেষজ্ঞ রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অল্প দর্শনীতে আনিয়ে দিলেন। গোপালবাবু ফুসফুস থেকে তরলপদার্থ টেনে এনে বিশ্লেষণাদি করে চিকিৎসা করলেন। তাতেও উপকার দর্শায়নি। মাত্র দু' তিনদিন সিটি কলেজের একতলায় শায়িত অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে ছেলেটি আর পরীক্ষা দিতে পারল না। বিপন্ন ও ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ হয়ে গোস্বামি মহাশয় হায় হায় করতে লাগলেন। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে তার মাকে আনা হল দেশ থেকে। মেসের সহৃদয় অধিবাসীরা ব্যবস্থা করে সম্পূর্ণ দুটি ঘর ছেড়ে দিল রোগী এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন ও শুশ্রূষাকারীদের জন্যে।. আমরা পালা করে শুশ্রূষা করে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলাম। গ্রে স্ট্রীট থেকে ডাঃ এস. সি. সেনগুপ্ত ও বেলগাছিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ এম্. এন্ ব্যানার্জিকেও এনে দেখাবার ব্যবস্থা হল। গোস্বামি-মহাশয়ের শিষ্যেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল এই ব্যাপারে। যমে-মানুষে লড়াই চলল।

ক'দিন ধরে রোগীর মা কাতরভাবে অনুনয় জানাতে লাগলেন, ডাঃ নীলরতন সরকারকে একবার আনলে হয়ত তাঁর বাছা রক্ষা পেত। টাকা-পয়সার অভাব থাকলেও সেজন্য কিছুই আটকাল না। স্যার নীলরতনকে আমরা দু' তিনজন call দিতে গেলাম। তখন হ্যারিসন রোডের বড়ো বাড়ী সুরজমল নাগরমলকে বিক্রয় করে ডাঃ সরকার সর্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে চলে গিয়েছেন। ওয়েলেসলী স্ট্রীট ধরে আমরা তাঁর নতুন বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে প্রয়োজনটি নিবেদন করলাম। ডাঃ সরকার জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ফি কত জানা

আছে তো ?" সম্প্রতি ষোলো টাকা থেকে তিনি ফি বাড়িয়ে বত্রিশ টাকা করেছিলেন। অত ফি তখন কোলকাতায় আর কোনও ডাক্তারের ছিল না। আমরা বিনীতভাবে জানালাম. "ফি আমরা দিতে পারব।" তিনি পরদিন সকালে যাবেন সময় নির্ধারণ করে দিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে মেসের দরজায় সৌমদর্শন ডাঃ সরকারের সুদর্শন গাড়ী এসে দাঁড়াল। ধীর সুশান্ত মূর্তি, সস্মিত মুখে তিনি পুরোনো ভাঙা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এলেন। জীর্ণ নিচু দোতলা বাড়ীর কতকটা খোলা ছাদ অতিক্রম করে রোগীর ঘরে ঢুকতেই রোগীর মা আর্তকণ্ঠে তাঁর পুত্রের জীবন ভিক্ষা করলেন। মাতৃসম্বোধনে তিনি তাঁকে অভয় দিয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করতে বললেন। মেস বাড়ীটির চারদিকে তাকিয়ে সমস্ত অবস্থাটা যেন প্রত্যক্ষ করে নিলেন। তারপরে অনেক সময় বিশেষ যত্ন করে রোগীকে পরীক্ষা করলেন। ডাঃ গোপাল চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময়বাবু দয়া করে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে হৃদ্যভাবে বহুক্ষণ ধরে আলোচনা ও পরামর্শ করে ব্যবস্থা লিখে দিলেন স্যার নীলরতন। পুনরায় রোগীর গ্রামদেশাগতা জননী ও অপর স্বজনবর্গকে সান্ত্বনা এবং শুশ্রূষাকারীদের উপদেশ দিয়ে ডাঃ সরকার বাইরে এলেন। তাঁর গাড়ীর দুয়ারে গিয়ে আমরা তিনখানা দশটাকার নোট ও ভাঙা দুটি টাকা ফি নিয়ে ধরলাম। কতকটা গম্ভীরভাবে বললেন, 'একি ?' আমরা বললাম, আপনার ফি। অমনি তিনি বললেন,—ফি আমি নিয়ে থাকি, কিন্তু সব জায়গায় কি নিতে হয় ? যাও, রোগীর শুশ্রূষা ও পথ্যের ভালো ব্যবস্থা কর। তাঁর মা-বাবাকে সান্ত্বনা দাও, তাঁরা বড় উতলা হয়েছেন।

এর পরে আর কিছু বলার সাহস হল না আমাদের। সেদিন চলে গেলেন স্যার নীলরতন। রোগের উপশম হয় না। এদিকে মা আবার উতলা হয়ে বললেন।—আর একবার তোমরা ডাঃ সরকারকে আন। কি অসুখ, সারবে কি না আমি তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করব। অত বড়ো ডাক্তারকে কি সে-কথা জিজ্ঞাসা করা যায় ? আমরা একটা বুদ্ধি ঠাওরালাম। খুব কাছেই ছিলেন রামমোহন রায় স্ট্রীটে ৺পূর্ণ লাহিড়ীর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—সম্পর্কে স্যার নীলরতনের বৈবাহিক, জানা ছিল আমাদের। তদ্বির করতে গেলাম বৃদ্ধের নিকট। সহানুভূতিপরায়ণ ঋষিপ্রতিম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আশ্বাস দিলেন এ-বিষয়ে কথা বলবেন তিনি

বৈবাহিকের সঙ্গে। আমাদের সেদিন বিদায় দিয়ে বললেন, পরে খবর নিতে। পরদিন সকালে অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বিতীয়বার স্যার নীলরতনের গাড়ী এসে মেসের দুয়ারে হাজির হল। বেরিয়ে এলেন ধীরগম্ভীর প্রশান্ত মানুষটি। এসে আবার ভালো করে রোগীকে দেখে সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলেন। বলা বাহুল্য সেদিন আর দর্শনী দেওয়ার প্রস্তাব করে কৃতঘ্নতা-প্রকাশ করিনি আমরা।

দরিদ্র পাঠার্থী গোস্বামি-সন্তান যোগজীবন রক্ষা পেল না শেষ পর্যন্ত! বাঁচাবার মালিক চিকিৎসক নন, মনে পড়ে, এমন একটি কথা সান্ত্বনাচ্ছলে সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক স্যার নীলরতন রোগীর মাকে বলেছিলেন। সত্যসন্ধ মানুষ ছিলেন তিনি। সত্যানুরাগ ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় তিনি যত বড়ো ছিলেন, হৃদয়ের ঐশ্বর্যে ও ভগবন্নির্ভরশীলতায়ও ঠিক তত বড়োই ছিলেন। প্রতিভার সঙ্গে হৃদয়বত্তা। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম! মণিকাঞ্চন-যোগ!

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ-শো-উনিশের বর্ষাকাল। আমরা কোলকাতা সংস্কৃত কলেজের তৃতীয়বর্ষ শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের সময়ে ইংরেজি-সংস্কৃত প্রভৃতি সাহিত্যিক বিষয়ের ব্যাখ্যাপুস্তক খুব বেশি ছিল না। তখন ইংরেজির নোটবই লিখতেন কোলকাতায় প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঢাকায় লিখতেন প্রবীণ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকার। আমরা প্রথমোক্ত অধ্যাপকের বই পড়তাম। সংস্কৃতের নোট বই লিখতেন অধ্যাপক জানকীনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন। আমরা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের জন্য এঁদের তিনজনের ব্যাখ্যাপুস্তকই সংগ্রহ করতাম।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক হলেও কলেজের বাইরে তাঁকে রাজনীতি-সংক্রান্ত সভাসমিতিতে প্রায়ই দেখতাম। গৌরবর্ণ তেজস্বী বাগ্মী পুরুষ। মুখে কাঁচাপাকা চাপদাড়ি, ঝড়ের মতো অনর্গল উচ্চাঙ্গের ইংরেজি বক্তৃতা দিয়ে যেতেন, উচ্চারণে বোধ হয় উষ্মবর্ণের শ্বাসাধিক্য

প্রকটিত হ'ত। অত্যন্ত রাশভারি লোক বলে মনে হ'ত। ছাত্রসমাজের ভয় ও ভক্তির ভাজন। ভালো ইংরেজি শিখবার প্রেরণার উৎস ছিলেন তিনি। তাঁর Henry V নাটকের ব্যাখ্যাপুস্তকের ভূমিকার প্রথম বাক্যটি আমাদের মুখে-মুখে সর্বদা আবৃত্তির বিষয় হয়ে ফিরত, "We have cart-loads of literature" ইত্যাদি দিয়ে প্রথম বাক্যটির আরম্ভ ছিল।

পলগ্রেভ-সঙ্কলিত ইংরেজি কবিতা-সংগ্রহ Golden Treasury আমাদের বি. এ.'র পাঠ্য ছিল। বার্ক-এর Speech on Conciliation with America পূর্বাপর বহুবৎসর যাবৎ পাঠ্য হয়ে আসছিল। আমার তখন সব বই কেনা হয়নি। অর্থাভাবের মধ্য দিয়ে পড়াশুনা করে চলেছিলাম। একদিন খেয়াল হ'ল, পূর্বোক্ত দু'খানি ইংরেজি পাঠ্যের ব্যাখ্যাপুস্তক চেয়ে নিতে হবে গ্রন্থকর্তার কাছে গিয়ে। শোনা ছিল, গ্রন্থকর্তারা তখন কিছু কিছু বই বিতরণ করতেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের জোরালো প্রশংসাপত্র সম্বল করে বিদ্যাসাগর কলেজে দেখা করতে গেলাম। দু'দিন গিয়ে দেখা পেলাম না। কলেজের আফিস থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করলাম, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে নরেন সেন স্কোয়ারের অনতিদূরে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তখন থাকতেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষার প্লাবনে মগ্ন কালীতলা অঞ্চলে প্রায় আধা-সাঁতার দিয়ে দু'ঘণ্টা সংগ্রামের পর নির্দিষ্ট গৃহের একতলায় একটি জানালার কাছে গিয়ে হাজির হ'লাম। জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলাম, স্বয়ং অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাসীন। দু'পাশে দু'জন দ্রুতাঙ্গুলিপিকার (স্টেনোগ্রাফার)। একজনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে অনর্গল ব'লে যাচ্ছেন বাগ্মী অধ্যাপক। সামনের ছোট টেবিলে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যবই এবং একখানি মাত্র অভিধান। আমি আ-কটি জলমগ্ন অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে জানালার শিক্ ধরে সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে শুনে যাচ্ছি—অধ্যাপকের দৃষ্টিপাতের সুযোগ প্রতীক্ষা করে। অধ্যাপক খানিকটা সময় একজনকে শ্রুতলিপি-লিখনের অধিকার দিয়ে তাঁকে বিরাম দিয়ে দ্বিতীয় লিপিকারকে বলতে শুরু করলেন। যতটা বুঝতে পেরেছিলাম, একজনকে নাটকের ভূমিকা বলে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় জনকে কবিতা-পাঠ্য Golden Treasury'র নূতন পাঠ্য অংশের ব্যাখ্যা ও শব্দটীকা প্রভৃতি বলে যাচ্ছেন। প্রায় একসঙ্গে দু'টি বই প্রকাশনের তাগিদ ছিল, বোধ হয়। প্রায় আধঘণ্টা

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও দাঁড়িয়ে তানলয়-বিশুদ্ধ চোস্ত ইংরেজি শোনবার পর হঠাৎ একটি ধমকের মতো কানে বাজল—"কে হে ছোকরা, তুমি ওখানে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি কর্চ্ছ? আমার কাছে দরকার? চলে এস—কি আশ্চর্য!"

থতোমতো খেয়ে ঘরে ঢুকলাম। "কি চাই?" আম্‌তা আম্‌তা করে পেঁচালো বাক্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনটি ব্যক্ত করলাম। পলকের জন্য একটু ভেবে একখানি চিরকুটে ইংরেজিতে দু'তিনটি বাক্য লিখে মুড়িয়ে আমার হাতে দিলেন। বললেন, "যাও, সেন ব্রাদার্সে ভোলানাথ সেনের কাছে এই চিঠিটা দেখাও। যাও—যাও!" বোধ হয়, ভাবনা-মগ্ন অর্ধ-সমাধিস্থ কর্মক্লিষ্ট অধ্যাপক আমার দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য হাতটাও নেড়েছিলেন। তখনই বেরিয়ে আবার কোথাও আ-জানু কোথাও আ-কটি জল ভেঙে অপরাহ্ণে কলেজ স্ট্রীটে সৌম্য সহাসবদন সহৃদয় প্রকাশক ভোলানাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গে চিঠি নিয়ে দেখা করলাম। সেনমহাশয় আমার সামনেই চিঠি খুলে পড়লেন। তাতে লেখা ছিল, Palgrave-এর Golden Treasury'র যে-অংশ প্রকাশিত হয়েছে তা ছাড়া Henry V, Burke, Asquith-এর 'Occasional Address'-এর ব্যাখ্যা-পুস্তকগুলি আমাকে দিয়ে দিতে এবং পরে পরে বি. এ.'র পাঠ্য আর যা-যা প্রকাশিত হবে তা-ও যেন আমাকে খবর দিয়ে দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত চিত্তে তিন-চারখানি নতুন মূল্যবান্ অর্থপুস্তক হাতে নিয়ে যখন মেসের সঙ্গীদের কাছে এসে রাশভারি অধ্যাপকের হৃদয়-দুর্গ আক্রমণের কাহিনী ব্যক্ত করলাম তারা আমার অসমসাহসিকতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিল। করুণার্দ্রচিত্ত অধ্যাপকের দানশীলতার সুযোগ গ্রহণ করবার গোপন সংকল্পও যে সঙ্গীদের কারও কারও অন্তরে সংক্রামিত করিনি, তা মনে হয় না।

করাল গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের একটি দুর্ঘটনায় অকালে এই কর্মক্লান্ত মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিক সারস্বত-প্রবরের জীবনাবসান হয়। সেবার রামহারহাটে কোনও অনুষ্ঠানে আহূত হয়ে জিতেন্দ্রলাল হল দেখলাম। সেখানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সর্বাগ্রে এই ঘটনাটি ব্যক্ত করতে হয়েছিল।

মা

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"

"মায়ের প্রাণে তোমার লাগি
জগত-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবনমাঝে নিয়ত রাজে ভুবনভুলানী

মা

আমার নিজের মা—আমার গর্ভধারিণী স্তন্যপীযূষদায়িনী, আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী। ছত্রিশ বছর আগে তাঁকে আমি হারিয়েছিলাম। "বিপৎসু ভয়দুঃখেষু যন্নামোচ্চারণং স্মৃতঃ", সেই ক্ষমারূপা স্নেহরূপা শান্তিরূপা, সুখদা শুভদা বরদা সাক্ষাদ্ ভগবতীকে জীবন-মধ্যাহ্নের দাবদাহের সময়ে হারিয়েছিলাম। স্নিগ্ধা প্রসন্না করুণাময়ী ভুবনেশ্বরীর ভুবন থেকে চিরনির্বাসিত হয়েছিলাম। 'চট্টলে সব্যবাহুশ্চ' বলে যাঁর পীঠ-প্রসিদ্ধি, আর অদূরে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ-রূপে যাঁর "ধকধ্বক্-ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে" সেই 'জগতঃ পিতরৌ' তাঁকে আত্মসাৎ করেছিলেন চট্টলভূমিতে, আমার কর্মস্থানে। অত্যাগ-সহনার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সেই ভূমি, চট্টগ্রাম। সেই পবিত্র মহাশ্মশান কর্মজীবনে ছিল আমার প্রবাস, অধুনা পররাষ্ট্র। কিন্তু চিরকালের জন্য সে-ভূমি আমার মায়ের কোল।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিঃ।"

মা আমার আছেন—তিনি নিত্যা। আমাকে চারিদিকে বেষ্টন করে প্রাচীতে প্রতীচীতে উত্তরে দক্ষিণে আমাকে রক্ষা করছেন। তিনি যে মহালয়া—জীবনে-মরণে লয়ে ও আলয়ে তিনি আছেন। মা নেই, সন্তান আছি —এ তো চেতনার কথা নয়, যুক্তির কথা নয়, মুক্তির কথাও নয়। তাই চিরন্তন শিশুকে সান্ত্বনা দিয়ে ব্রহ্মপন্থী হয়েও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"মায়ের প্রাণে তোমার লাগি জগত-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী।"

গীতাঞ্জলিতে সুরের স্পন্দন জাগিয়ে তিনি গেয়েছেন,

"তোমারে নমি হে সকল ভুবন-মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে,
তনুমনধন করি নিবেদন ভকতিপাবন
তোমারি পূজার ধূপে।"

আমার মনে হয়, বিশ্বকবির এই সাধনসঙ্গীতে সাধনশাস্ত্র সপ্তশতী চণ্ডী প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

এইবার কাহিনীটি বলি। আমাদের পৈতৃকগৃহের ঠাকুরদালান। অভ্যাসমতো প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে বাবা গৃহবিগ্রহের পূজায় বসেছেন। দ্বিভুজ মুরলীধর বিগ্রহ, কালাচাঁদ-প্রসিদ্ধি। সহস্র যাঁর শির, সহস্র যাঁর অক্ষি, সহস্র চরণ, সেই সর্বত্রগ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তর্যামী সর্বভূতান্তরাত্মা দশাঙ্গুল-সামীপ্যে বিরাজিত হয়ে সেবা গ্রহণ করছেন, এই শ্রৌতমন্ত্রে ঠাকুরকে স্নান করাচ্ছেন,

"সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥"

প্রীতিভরে স্নান ও অঙ্গরাগ করাতে গিয়ে তিনি বেশ-কিছু সময় দিতেন। সেই অবসরে অনুভবের বৈচিত্র্য অনুসারে কোনদিন গীতা কোনদিন চণ্ডীর অংশবিশেষ আবৃত্তি করে যেতেন। একদিন শুনলাম প্রাণপূর্ণ আবৃত্তি।

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদ্
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥"

উদাত্তমধুর কম্পিত কণ্ঠের আবৃত্তি, আর চোখে জল। আজ একি! গম্ভীর মানুষটি! কোনদিন কাঁদতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ছুটে মার কাছে গেলাম। বললাম—মা, হয়েছে! বাবা বোধ হয় পাগল হয়ে যাবেন এবার। বাবা কাঁদছেন। করাচ্ছেন কালাচাঁদ ঠাকুরকে স্নান। সেই সঙ্গে চণ্ডীপাঠ। তার সঙ্গে আবার কান্না!

জিজ্ঞাসা করলেন মা, চণ্ডীর কোন্ অংশ পড়ছেন। হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর দেমাকি ছাত্র আমি, সংস্কৃতে নব্বুই-এর বেশি ছাড়া কম নম্বর পাইনি

কোনদিন। আ-শৈশব শুনে শুনে চণ্ডীর এ অংশ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার অভিমান, এত বড়ো সংস্কৃতবেত্তা আমি! আমি কি এই প্রশস্তির সহজ কথাগুলি বুঝিনে? মার কাছে বক্তৃতা ঝাড়লাম, "তুমি জগতের আধার। মাটি হয়ে সকলকে তুমি ধারণ কর, জল হয়ে স্নিগ্ধ কর।" এর মধ্যে এমন কি আছে মা, যাতে বাবার কান্না পায়?

আমরা যাকে সাধারণতঃ বিদুষী বলি, আমার মা তা ছিলেন না। সামান্য-মাত্র অক্ষরজ্ঞান। কিন্তু ছেলেবেলায় পিত্রালয়ে যশোহরের কালিয়া গ্রামে মামা-বাড়ীর প্রতিবেশী প্রসিদ্ধ সেনপরিবারে যাত্রা ও কথকতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে শুনে তৈরি হয়েছিলেন। আমাদের সংসারে এসেও পূজা-অর্চনায় বিগ্রহসেবায় নিজের স্থান ও অধিকারটুকু দরদ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, নিষ্ঠা দিয়ে পালন করতেন। মা একটু হেসে বললেন, তোর যেমন আমি আছি, ওঁর তো তেমন মা নেই। আমার শাশুড়ী তো অনেক দিন আগেই চলে গেছেন। উনি তাঁর মতো একটি আশ্রয় খোঁজেন। সবাই খোঁজে—সবারই দরকার।

আমাদের আচরণ থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। শীতকালে মাঠের ধান উঠে যায়। ধানগাছের গোড়া বা নাড়ার অবশেষ থাকে। সেই নাড়ার ভুঁইএ আমরা ক্রিকেট খেলতে যেতাম। শীতকালে নতুন ধান ও নতুন গুড় ওঠার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কখনও-কখনও বিসূচিকা মহামারীর আকারে দেখা দিত। কিছু মৃত্যুও ঘটত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দূরে হরিধ্বনি দিয়ে চলেছে শববাহকেরা। শুনেই খেলা ভেঙে দিয়ে ভয়ে ছুটে দিতাম কিশোর খেলোয়াড়ের দল। বে-দম ছুটে এসে একেবারে মাকে জড়িয়ে-ধরা। মা গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে "ভয় নেই ভয় নেই", বলে কর ফিরিয়ে মাথায় ইষ্টমন্ত্র জপ করে দিতেন। গায়ে ঘাম দিয়ে ভয়ের ভূত ঘাড় থেকে নেমে যেত। "যদ্‌বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্।"

সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মা বললেন—"মায়ের কোল সবাই খোঁজে। মাটি ঠিক যেন মা-টি, মায়ের কোলের মতো ধরে থাকে। জল যেন মায়ের স্পর্শের মতো শীতল-করা স্পর্শ দেয়। সকলেরই একজন মা আছেন। উনি নিজের মাকে হারিয়ে সেই মা-কে খোঁজেন। তাই ওঁর চোখে জল।"— মায়ের এই সহজ কথায় চণ্ডীব্যাখ্যা শুনে আমি হেসে উঠলাম। বললাম, "খুব তো

পণ্ডিতের মেয়ে তুমি! আমি সংস্কৃত কত ভালো শিখেছি। আমি আর ঐ-কথাগুলির মানে বুঝিনে! ওর মধ্যে কান্নার কি আছে, তুমি যা-ই বল, মা, আমি কিন্তু বুঝে পাইনে।" মা আর কিছু বললেন না। "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" অথবা মা সে-দিন গভীর অনুভব দিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন নিজের ইষ্টের কাছে, কথাটি যেন তাঁর অবোধ সন্তান একদিন বুঝতে পারে—বিশ্বাস করতে পারে তাঁরই মতন করে। আমিও তো তখন থেকে আবৃত্তি করি—উপনয়ন হয়ে গিয়েছিল আমার যথাকালে। "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

গ্রীষ্মের প্রারম্ভ। চলেছি মামাবাড়ীতে—কালিয়া গ্রামে স্টিমারে চড়ে। আই. জি. এস. এন. কোম্পানির একতলা গণেশ-স্টিমার। নামটি সিদ্ধিদাতার, সিদ্ধিপ্রদ। সঙ্গী এক বলিষ্ঠ যুবক। নাতি বড়ো হয়েছে। অনেকদিন দেখেননি আমাকে মাতামহী। শুনেছেন, বড়ো হয়েছি, পড়াশুনা করি—একবার আনিয়ে দেখবার সাধ হয়েছে বৃদ্ধার। তাই সাদর আহ্বান পেয়ে চলেছি মাতামহী-দর্শনে। মা সঙ্গে দিয়েছেন তাঁর মায়ের জন্যে নানাদ্রব্যসম্ভার—যত-না মূল্য তার, তার অনেকগুণ বেশি দরদ তার সঙ্গে। পোটলা বেঁধে আগলে নিয়ে চলেছি আমরা দু'জনে, একটি ক্ষীণাঙ্গ কিশোর ও অপরটি বলিষ্ঠ যুবক। স্টিমারের অগ্রভাগে বয়লারের কাছে বসেছি—বসে জল দেখছি। আর দেখছি নানা মাপের নানা আকারের ডিঙি, টাবুরে-নৌকা, বড়ো ছৈ-ওয়ালা পানসী তীরের মাঠ-ঘাট, হাট-বাট, চলমান গাছপালা নারিকেল-শুপারি বেত তেঁতুল, কলার ঝাড়, বাঁশবাগান, কুঁড়েঘর, টিনের গুদাম, পাকাবাড়ী। নির্বাক হয়ে দেখছি, গুণছি।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সময়টা কালবৈশাখির। নদী অবশ্য বেশি বড়ো নয়। পদ্মা, মেঘনা নয়। ভৈরব শেষ করে নবগঙ্গায় পড়েছি। দু'ধারে তটভূমির গাছপালা তেমন স্পষ্ট করে আর দেখা যায় না। হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিল, নদীর জল কালো নিশ্চল হ'ল। প্রথমে ঠাণ্ডা বাতাস, পরে বেগে ঝড় বইল। সঙ্গে বৃষ্টি, বজ্র ও বিদ্যুৎ। বাইরে যেন দৈত্যরাজের মাতামাতি শুরু হয়ে গেল। মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভনিশুম্ভ, চণ্ডীর গল্প, মায়ের সহজ চণ্ডীব্যাখ্যা, সব মনে পড়তে লাগল। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সঙ্গী অভয় দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ও অপর যাত্রীদের মুখেও ভয়ের ছাপ দেখলাম। এই অবস্থায় স্টিমার

থামিয়ে না দিয়ে অভিজ্ঞ সারেঙ্ আস্তে আস্তে চালিয়ে এগুচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছিনে কিন্তু পরে জানা গেল কূলের কাছ ঘেঁষেই স্টিমার চলছিল। চারদিকে তিমির-যবনিকা, আর প্রতিকূলা বিভীষিকাময়ী প্রকৃতি।

হঠাৎ স্টিমারের বয়লার থেকে এক কর্ণবধিরকারী শব্দ উঠল। ব্যাপারটি অবশ্য কিছুই নয়, আকস্মিক বাষ্পনিঃসরণের তুমুল শব্দ। কিন্তু সে-কথা না জেনে ভয় পেয়ে আমি ভাবলাম, বুঝি স্টিমারের বয়লার ফেটে গেল। বাল্যে শুনেছি, বয়লার ফাটলে স্টিমার ডুবে যায়। ঝড়ের বেগ তখন অনেকখানি প্রশমিত হয়েছিল। তারের অনুচ্চ বেষ্টনী ডিঙ্গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম নদীতে। স্টিমার আস্তে চলছিল। তাই রক্ষা পেলাম। নইলে স্টিমারের তলে চলে গিয়ে চাপা পড়তাম, পড়ার সঙ্গেসঙ্গেই সলিল-সমাধিলাভ হ'ত। সঙ্গী এবং কাছের অপরাপর যাত্রীরা হায় হায় করে উঠলেন। এর মধ্যেই স্টিমার কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে। স্টিমার থামিয়ে আমাকে কুড়িয়ে নেবার কোনও প্রস্তাব ও প্রয়াস হবার পূর্বে (যে প্রস্তাব অনতিবিলম্বে কাজে পরিণত হয়েছিল) আমার সঙ্কট-মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই আমার এখানকার বর্ণনার বিষয়।

চারদিকে আঁধার। গেঁয়ো ছেলে আমি, সাঁতার বেশ জানতাম। কিন্তু পায়ে মাটি ঠেকে না কোথাও। কত গভীর জল, তীর থেকে কত দূরে আছি? নদীতে তো সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা নেই, তাতে আবার দুর্যোগময়ী রাত্রির অন্ধকার। জলে হাঙর কুমীর আছে। ভয়ে সাঁতারের অধ্যবসায় জল হয়ে এল। বাইরে ঝড় তুফান বইছে। এতটুকু মাটি আজ যদি পাই—দু'খানি পা রাখবার মতো সঙ্কীর্ণ একটুকু মাটি—তা হলে বর্তে যাই। হায় মাটি, তুমি নাকি মায়ের কোল? জল—এত জল! হায় জল, তুমি নাকি মায়ের মত স্পর্শ দিয়ে আপ্যায়ন কর? কিন্তু এ জল যেন রাক্ষসী, আমাকে গ্রাস করবে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তের অভিজ্ঞতা কেউ লিপিবদ্ধ করে যেতে পারেন নি। মনে হয়, তখন বোধ হয়, অতীত জীবনের সমস্ত অনুভব ও অভিজ্ঞতা পুঞ্জিত চেতনার বিষয় হয়ে মনে জেগে ওঠে। সবার আগে আমার মনের চোখে ভেসে উঠলেন মা, তার পরে বাবা, ভাইবোনেরা, খেলার সাথী, পড়ার সঙ্গী, শিক্ষক মহাশয়েরা, সেই সঙ্গে মনে এসে ধাক্কা দিল বাবার সেই চণ্ডীপাঠ ও চোখের জল আর মায়ের সেই সহজ সরল বিশ্বাস-মাখা অন্তর-ছোঁয়া চণ্ডীর ব্যাখ্যা।

প্রথমে দুর্জয় অভিমান জাগল আমার, এই বুঝি সব শেষ। মায়ের চণ্ডী

বোঝানো, বাবার চোখের জল, সব মিথ্যা। মাটি হয়ে তুমি কোল দেও, জল হয়ে স্নিগ্ধ আপ্যায়ন কর—চণ্ডীর এসব মিথ্যা কথার ছলনা। কিন্তু এ-কি! এ-কি সত্য? পরমুহূর্তেই হঠাৎ পায়ের তলায় মাটি ঠেকল। কূলের কাছেই তো ছিলাম। প্রাণের ভয়ে অজ্ঞাতসারে কিছু ঝাঁপাঝাঁপি করে এগিয়েছিলামও কতকটা। মাটির পরশ পেয়ে পলকের মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকের মতো অনুভব একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়াল। অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাস বিজয়ী হয়ে ফিরে এল। তখন মা-র সরল চণ্ডীব্যাখ্যার স্ফুরণ হ'ল সমস্ত অন্তরে, সমগ্র সত্তায়। তখন মাটি হয়ে উঠলেন মা-টি, মায়ের কোল। জল হয়ে উঠলেন মায়ের স্নেহ-সুশীতল স্পর্শ।

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদ্
আপ্যায়্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥"

আমার মায়ের প্রাণে এসে জগন্মাতা একদিন এই নির্বোধ অর্বাচীনের যে প্রাণ জাগাতে চেয়েছিলেন মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্য দিয়ে আজ সে প্রাণের নতুন বোধন হ'ল। চণ্ডীর যে-অংশ মা সেদিন বুঝিয়েছিলেন সেই অংশর সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর অনেক কথা স্ফূর্ত হয়ে উঠল,

"দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্রস্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্।"

আমি ডাঙ্গায় উঠলাম। অদূরে স্টিমার গিয়ে ভিড়ল। আমাকে তুলে নেওয়া হ'ল। বসুন্ধরা-মাতার ভারস্বরূপ একটি জীব সেদিন কালসিন্ধুতে নিমগ্ন হতে হতে রক্ষা পেল। আজ মনে হয়, সেদিন যদি ক্ষমারূপা জীবনময়ী না হয়ে মৃত্যুরূপা নিষ্করুণা হয়ে মা আমার জীবনে আবির্ভূতা হতেন তা হলেও সপ্তশতীর মহামন্ত্র মিথ্যা হ'ত না। কারণ মা হলেন "সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতা সনাতনী।" আমার স্থিতিতেও তিনি বিনাশেও তিনি। মহান্ লয় ও মহান্ আলয় তিনি। তাই তিনি মহালয়া। মা-ই আছেন। আমরা সব মা'তেই আছি। মা-ছাড়া আর কে আছেন, কি আছে? "দ্বিতীয়া কা মমাপরা?"

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥"